খাদেমুল ফোক্বারা অছিয়ে গাউসুল আযম

জ্ঞান ভাণ্ডার হযরত

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

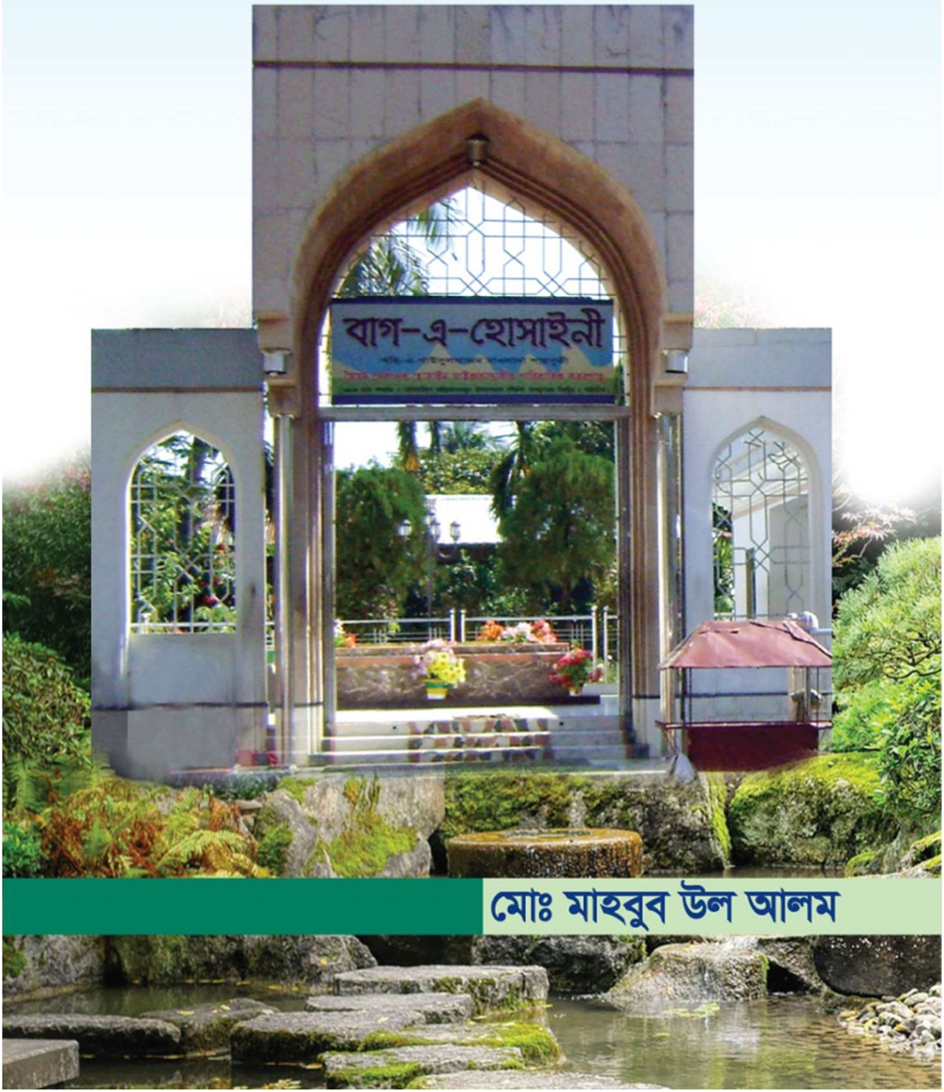

মোঃ মাহবুব উল আলম

খাদেমুল ফোক্বারা অছিয়ে গাউসুল আযম জ্ঞান ভাণ্ডার হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা শাখা 'আলোকধারা বুক্স'-এর পক্ষে

প্রকাশক :
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ,
ডাক- ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম– ৪৩৫২

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ :
২৬ আশ্বিন ১৪৩১ বাংলা, ১১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

মুদ্রণ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম– ৪২১২।

পরিবেশনা: (১) আলোকধারা ১৮-১৯, লেভেল ১,
সাফ আমিন শপিং মল, ১৫৮ কলেজ রোড,
চকবাজার, চট্টগ্রাম– ৪২০৩ মোবাইল: ০১৬৪৭-৫৩৩০৮৪,
f.alokdharabooks
২. গাউসিয়া হক মন্‌জিল
দরবার-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী,
মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২
এবং বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

ISBN: 978-984-8083-33-8

মূল্য: ৫০০ টাকা মাত্র
মার্কিন ডলার: ১০ ৳

Published by Syed Mohammad Hasan on behalf of Alokdhara Books, a concern of Shahanshah Hazrat Syed Ziaul Huq Maizbhandari (KA.) Trust, Gausia Huq Manzil, Maizbhandar Sharif. Po. Bhandar Sharif, Fatickchari, Chattogram-4352

উৎসর্গ

মহতী মহিলা সুফি-হেরেমে মুল্‌কে বঙ্গাল তথা
বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারিনী
মোহতারামা সৈয়দা আনোয়ারুন্নেসা (তোতা ময়না)
মোহতারামা সৈয়দা সাজেদা খাতুন
এবং
উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম– এই তিন
মহিয়সীর স্নিগ্ধ স্নেহের চাঁদোয়া তলে–

পেশ কালাম

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১. অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) শিল্পবিপ্লবোত্তর আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল বাংলা ভাষায় মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার শাব্দিক সবাক মহান রূপকার। বিশ্বনন্দিত দার্শনিক ড. মুহম্মদ ইকবাল-এর মূল্যায়নে; আল-কোরআন নাযিলের ধারায় নবিজী হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে পৃথিবীতে মানব সমাজে শাশ্বত আধুনিকতার অভিযাত্রা। এই আধুনিক মননকে মূল ইসলামী জীবনধারার অনুগামী হিসেবে চিত্রিত করে অছিয়ে গাউসুল আযম যুগোপযোগী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকাকে স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন।

২. মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা বেলায়তে মোত্‌লাকা অধ্যয়ন ও চর্চায় তাঁর রচনাগুলো বিশ্বস্ত অবলম্বন। তাসাওউফ যে জীবন বিমুখ কোন কল্পজগৎ নয়, বরং কর্ম ও সংগ্রামের আলোয় উজ্জ্বল এক কল্যাণকর জগৎ– তাঁর রচনাবলী সেই খগোলের স্বরূপ উন্মোচন করেছে। এছাড়াও তাসাওউফের সাথে পার্থিব বাস্তব মানবিক সমস্যাবলির নিবিড় সম্পর্ক এবং সেগুলোর সুষম সমাধানে উপনীত হবার সহজতর পন্থাসমূহও এসব রচনায় বর্ণিত হয়েছে। মানবজাতির যে কোন সদস্য এগুলো থেকে উপকার আহরণ করতে পারবেন। আল-কোরআন, নবিজী (দ.) যেমন সর্বমানবিক ও সর্বোপযোগী তেমনি এই পদাঙ্ক অনুসরণে বহুত্ববাদী

মানবিক 'কল্যাণময়ী ঐক্যে'র বার্তা শোনায় তাঁর গ্রন্থাবলি। জ্ঞানভাণ্ডার অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)–পুস্তকটি মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যে নবতর গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বটে।

আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক পাঠকই নিজ নিজ মেধানুসারে কল্যাণ সংগ্রহে সক্ষম হবেন। আমিন!

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
সাজ্জাদানশীন
গাউসিয়া হক মন্‌জিল, দরবার-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী
ও
ম্যানেজিং ট্রাস্টি
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট
মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

প্রাককথন

১. বিংশ শতকীয় আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের প্রগতিশীল বিবর্তনের নির্ভরযোগ্য আধ্যাত্মিক দিশারী, খাদেমুল ফোক্বারা অছিয়ে গাউসুল আযম, জ্ঞান-ভাণ্ডার হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) স্বীয় জীবনব্যাপি সাধনার সোনালী ফসল, দার্শনিক চিন্তা-তত্ত্ব সমৃদ্ধ গ্রন্থ, সামাজিক-ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের আচরণবিধি সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ পুস্তক-পুস্তিকাদি; তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিমল অধ্যাত্ম আলোয় স্নিক্ত সংগঠন "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী" গঠনতন্ত্র এবং এর পাশাপাশি বহুবিধ কর্মযজ্ঞ প্রভৃতি এমন সুবিন্যস্তভাবে অভিন্নসূত্রে গ্রথিত, যা কোন প্রথম বিচক্ষণ দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয় যে– আল-কোরআন ধ্বংসশীল পৃথিবীর স্থায়িত্বকালীন বাস্তবতা বিবর্জিত কোন শব্দ সমষ্টি নয়, বরং মরণশীল মানুষের অন্তর ও বাহিরের জন্মগত চাহিদা পূরণের সহজ উপায় নির্দেশক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত-সমৃদ্ধ গাইড লাইন। বলা যায়, সৃজনশীল প্রজাতি হিসেবে মরণশীল মানুষের (Mortal) জীবনে যুগপৎ দৃশ্যমান ও দৃশ্যাতীত বিষয়াদির ধারাপাত। আরো বিশ্লেষণমূলকভাবে বলা যায়, আল-কোরআন ব্যাপকতর অর্থে মানবজীবন তথা সৃষ্ট জগতের পুরো ব্যাপ্তি (Gamut) সম্পর্কে সহজবোধ্য সম্যক যুক্তিমন্ত ধারণাপত্র। যে কোন আধুনিক তথা সপ্তদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দী উত্তর সমাজতাত্ত্বিক ও বিজ্ঞানালোকিত বিশ্লেষণে মানব প্রজাতি তো বটেই, বরং কুল-মাখলুকাতের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন (আয়াত) আখেরী নবি হযরত মুহাম্মদ (দ.) ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণময়তার আলোর উৎস।

লিখিতভাবে প্রাপ্ত সকল প্রকার তথ্য এই সাক্ষ্য দেয় যে, নবিজী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এবং তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবি-রাসূলই সমকালে কোন মানুষ তথা পার্থিব কোন বস্তুর কাছে কোন প্রকার বিনিময় চাননি। নিজেরা শত প্রতিবন্ধকতা, নির্যাতন, বঞ্চনা, উপেক্ষা-অপমান নীরবে অহিংসভাবে সহ্য করে স্বগোত্রীয় তথা বিশ্ব মানবতা ও বিশ্ব প্রকৃতির কল্যাণের জন্য নিজেদের সকল কর্মপ্রয়াস, সাধনা-সংগ্রাম উৎসর্গ করেছেন। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) আখেরী নবি হযরত মুহাম্মদকে (দ.) যথার্থ প্রমাণসহকারে অভিহিত করেছেন 'বিশ্ব মানবতার প্রতীক' হিসেবে। এই ধারাবাহিকতায় নবিজী (দ.) তথা আল-কোরআনের মহান মিশনের কার্যকারক ওয়ারিশ তথা পর্যায়ক্রমিক উত্তরাধিকারী মহান ওলী-আল্লাহ্‌দের জীবন-সাধনার মোড়ক উন্মোচন করেছেন তিনি অত্যন্ত যত্ন ও বিজ্ঞতাসহকারে। তাঁর রচিত বিভিন্ন পুস্তক/পুস্তিকা এ কথার যথার্থতা ধারণ করে।

২. এই মহান বঙ্গজ মনীষীর দর্শন ও ইতিহাসের উপাত্তসমৃদ্ধ রচনাবলি অত্যন্ত সহজ বাংলা ভাষায় তাসাওউফ এবং সাধারণ (General) দর্শনের বিভিন্ন শাখার সারসত্তা ধারণ করে। দর্শনশাস্ত্রের শাখা-উপশাখা অনেক, যেমন: (ক) প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক দর্শন, (খ) জ্ঞানতত্ত্ব, (গ) বিজ্ঞানতত্ত্ব, (ঘ) স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, (ঙ) প্রাণসত্তা ও প্রাণীজীবন বিষয়ক তত্ত্ব, (চ) সৃজন, প্রতিপালন ও বিবর্তন বিষয়ক তত্ত্ব, (ছ) আত্মা/মনের দর্শন, (জ) ব্যক্তি ও সমাজ দর্শন, (ঝ) নৈতিকতা দর্শন, (ঞ) লোকধারণাতীত 'ঐশী সচেতন' সত্তার দর্শন, (ট) সৃষ্টির উৎস বা কারণ হিসেবে তৌহিদী আস্তিক্যবাদী দর্শন, (ঠ) নৈতিক শাসন-প্রশাসন-সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা এবং ভালো-মন্দের পাশাপাশি অবস্থান ও দ্বন্দ্বের দর্শন, (ড) আহার-বিহার-জীবন ধারণ, সংসার-পরিবার পালন প্রভৃতি সমস্যা ও সংগ্রামের দর্শন, (ঢ) বস্তুবাদী দর্শন, (ন) অস্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ক দর্শন প্রভৃতি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মানুষের চেতনা ও ক্রিয়াশীলতার পর্যায় ও মাত্রা বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী জের হিসেবে জ্ঞানসাধনা তথা দর্শন-বিজ্ঞান সাধনার পরিধি কতদূর বিস্তৃত হবে, বিকশিত হবে তা আন্দাজ করা কোনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আল্লাহ্ আল-কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন, 'তিনিই নিজ অনুগ্রহে আসমান ও জমিনের সব কিছুকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন,

নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল কওমের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে – (সূরা জাসিয়া : ৪৫:১৩)। নবিজীর (দ.) মিরাজ এরই এক ঝলক প্রমাণও বটে।

৩. অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বাংলা ভাষায় একাধিক বিষয়ে গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করে বাংলা ভাষায় আল-কোরআন ও নবিজীর (দ.) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর লিখিত 'দর্শন বিষয়ক' গ্রন্থ 'বেলায়তে মোত্লাকা' এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবনী ও কেরামত' এবং অন্যান্য সামাজিক-দর্শন বিষয়ক পুস্তিকাসমূহ ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, দৈনন্দিন জীবনঘনিষ্ঠ মৃত্তিকামুখী-গণমুখী চেতনার আকর। এসব রচনা আটপৌরে লোকায়ত ইপ্সিত (Optimum) আচরণের সূচিপত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর পাশাপাশি সমাজ-প্রশাসন-বিশ্বশান্তি ও সমতা, সৎ সংগঠন, এমনকি আটপৌরে মুসলিম-ধর্মাচার বিষয়ে যে সব সহজ পুস্তক বাংলা ভাষায় তিনি রেখে গেছেন, সেগুলো বাংলাদেশ তথা বঙ্গভাষাভাষী সকল সমাজের কল্যাণকর সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমাদের জ্ঞানান্বেষী ভবিষ্যৎ জেনারেশন সমাজ-রাষ্ট্র দর্শনসমেত জীবনের সর্বক্ষেত্রে এসব রচনার সাহায্যে কোন না কোনভাবে উপকৃত হতে থাকবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

৪. এই পৃথিবী এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী সর্ব প্রকার ও বিচিত্র মননের মানব মণ্ডলীকে কর্মে, ধর্মে, মর্মে, জ্ঞানে, সাধনায়, সততায়, সমাজে, সমতায় শান্তিপূর্ণ কল্যাণপ্রদ সহাবস্থানের নৈতিক ও প্রায়োগিক রূপরেখায় আবদ্ধ করে বহুত্ববাদী আনন্দময় মানবভূবন (সমাজ-রাষ্ট্র-দেশ নির্বিশেষ পরিসরে) নির্মাণের যে রূপরেখা মহান মদিনা সনদে (সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে) বর্ণিত হয়েছে, তারই নীতির অনুবর্তনে বাংলাদেশ অঞ্চলে আন্তরিকতা ও সহযোগিতাপূর্ণ লোক-সমাজ নির্মাণের প্রেরণা বর্ষণ করেছে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গ্রন্থ ও রচনাবলি। এগুলো কেবল মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে নয়, তাসাওউফ এবং দর্শন ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হিসেবে বিরাজ করছে। বর্তমান এই গ্রন্থে তাঁকে 'জ্ঞানভাণ্ডার' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। এই বিশেষণে তাঁকে প্রথম বিশেষায়িত করা হয় ১৯৮২ খ্রি. জনাব জামাল আহমদ সিকদার প্রণীত 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.)' জীবনী গ্রন্থে। এ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১০ পৌষ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯৮২ইং। এ প্রকাশনার সাথে যুক্ত থাকার পরম সৌভাগ্য আমার মতো আকিঞ্চনেরও

হয়েছিল। সমকালীন প্রবীণ মাইজভাণ্ডারী বিদ্বজ্জন, সাধক, ভক্ত, কবি-শায়েরগণের সামষ্টিক চিন্তা-ভাবনাপ্রসূত সিদ্ধান্তক্রমে এই গ্রন্থে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিষয়ক অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয় "পূরবী সূর্য", গাউসুল আযম বিলবিরাসত হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিষয়ক অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয় 'করুণাধারা' এবং এই ধারাবাহিকতায় অছিয়ে গাউসুল আযম, খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিষয়ক অধ্যায়ের শিরোনাম রাখা হয় 'জ্ঞান ভাণ্ডার'। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর অন্যতম মৌলিক পরিচয় নির্দেশক এই বিশেষণটাই প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁকে বলা চলে, মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সবাক প্রতিভূ। তাঁর অমর সৃষ্টি 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' যেন মোহাম্মদী সুন্নতের ধারাপাত।

৫. অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী নিজস্ব একটি সুন্দর সমাজ-ভাবনা লালন করতেন। এই ভাবনাকে তিনি প্রকাশ ও বিন্যস্ত করেছেন 'সুফি সভ্যতা' নামক পরিভাষায় (Term)। এ বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'বেলায়তে মোত্‌লাকা'-এর দ্বাদশ অধ্যায় 'সুফি সভ্যতা দিশারী' শীর্ষক বিবরণে। এতে একজন আধুনিক সমাজ সচেতন সৎ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির চির আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়; যা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মহান নবি-রাসুল, ওলি আল্লাহ্, সমাজসচেতন দার্শনিকদের জীবন ও কর্মের অনুশীলন বটে। পাঁচ সৎ খলিফা, চারি ইমাম, সিহাহ্ সিত্তাহ হাদিস সংগ্রাহক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিপুষ্ট মহান হাদিসবেত্তাগণের ধারাবাহিকতায় হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.), হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশ্‌তি (র.), হযরত দাতাগঞ্জে বক্‌শ (র.), দার্শনিক-কবি মওলানা জালালুদ্দিন রুমী (র.), ড. মোহাম্মদ ইকবালের প্রগতি ও সাম্যমুখী চিন্তা ও দর্শনের আলোকে তাঁর এই গ্রন্থ আলোকিত। 'সুফি সভ্যতা দিশারী' অধ্যায়ে 'ধনতন্ত্র ও নাস্তিকতাবাদের মূল উৎপাটনকারী ধনসাম্য উৎসাহী বিশ্বশান্তি', ব্যক্তিকেন্দ্রিক অতি ধনসঞ্চয় প্রবণতা, বর্ণ বৈষম্যবাদ, ধর্মাচার ভিত্তিক বিরোধ, ধর্মের নামে হাজার বছর ধরে ঘৃড়ুত অথচ চলে আসা তেজারত প্রভৃতি অবাঞ্ছিত বিষয় সম্পর্কে আধুনিক মানবতাবাদী, তথ্যনিষ্ঠ মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের নব নবতর প্রজন্ম এসব বিষয় থেকে আলোকিত চেতনার ভাণ্ডারের সন্ধান পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ্ রাব্বুল

আলামিন আগামীর প্রজন্মদের এ জন্যে প্রয়োজনীয় তৌফিক এনায়েত করুন। আমিন!

৬. এই গ্রন্থে বিবৃত তথ্যাদি ইতোপূর্বে প্রকাশিত মুদ্রিত বিষয়াদি নির্ভর। আনকোরা নতুন কোন বিষয় বা তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

পুস্তকে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক শব্দগুলো হলো: হযরত আকদাস (হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী ক.), বাবাজান কেবলা (গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান ক.), অছিয়ে গাউসুল আযম (হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী ক.), শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী / হুজুর (হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ক.)।

৭. এই পুস্তক প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম. জি. আ.)-এর ইঙ্গিত গুরুভার "মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী একটি সমীক্ষণবাদী উপস্থাপনা" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নকালে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিক থেকে বহু গ্রন্থকারের পুস্তক বিশেষ করে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রণীত "বেলায়তে মোত্‌লাকা"সহ বিভিন্ন গ্রন্থের লাইনে লাইনে ঘুরতে হয়। এ সময়েই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং খোদ অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সম্পর্কে নতুন নতুন বিস্ময়কর বাস্তবমুখী ধারণার উন্মেষ ঘটতে থাকে এবং সযত্নে সেগুলো নোট করে রাখা হয়। প্রত্যেক নবি-রসুল এবং মহান অলি আল্লাহ্ শ্রেণির দার্শনিকরা চির-আধুনিকতার প্রতীক। তাঁদের চিন্তা ও কর্ম কখনো অতীতের বিষয়ে পর্যবসিত হয়নি এবং হবার নয়; বরং চির সচল মানব জাতির কোন না কোন অংশের এমনকি গড়পড়তাভাবে সমগ্র মানবজাতির কোন না কোন প্রকার উপযোগিতায় আসে। মহানবি মহানবি মোহাম্মদ (দ.)-এর পার্থিব-অপার্থিব শিক্ষা-আচরণ-দর্শনের ব্যাপকত্ব এমনই যে, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্র গঠন ও ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ে প্রাজ্ঞ শ্রদ্ধাভাজন মনীষীদের চিন্তা ও কর্মের আলোকরশ্মি তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। তবুও মানবিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনা অবশ্যই

হাদিসে রসুল (দ.) মতেও পঠনীয় ও সম্মানার্থই। এভাবে তিল তিল করে সঞ্চিত তথ্য-উপাত্তের সমাহারে 'হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী' এবং 'জ্ঞানভাণ্ডার অছিয়ে গাউসুল আযম দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)' গ্রন্থদ্বয়ের অবয়ব নির্মিত হয়ে উঠে 'মাইজভাণ্ডারী বেলাতের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী একটি সমীক্ষণবাদী উপস্থাপনা' গ্রন্থ প্রকাশনা পর্যায়ে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের একগুচ্ছ বিদ্বজ্জন ও আশেক-কর্মী প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যাপক জহুর উল আলম, ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ, মওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ, মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান টুটুল প্রমুখ নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিমার্জনা, সংশোধনী প্রক্রিয়ায় শরিক হন, যার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১১ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে। এই ধারাবাহিকতায় মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী [একটি সমীক্ষণবাদী উপস্থাপনা], হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী গ্রন্থ 'আলোকধারা বুক্স' প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয় "বহুত্ববাদী পালনবাদী সমাজের অভিভাবক মহান চির আধুনিক মানব গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)" জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'-এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম. জি. আ.)-এর তত্ত্বাবধানে। বর্তমান গ্রন্থ "খাদেমুল ফোক্বারা অছিয়ে গাউসুল আযম জ্ঞান ভাণ্ডার হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)" একই ধারাবাহিকতার ফসল। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে লেগে থাকা সাংবাদিকতা পেশা থেকে আচমকা ছিটকে পড়ার পর বিভিন্ন অসুবিধা, প্রতিবন্ধকতা জর্জরিত জীবনে বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো আমি হৃদরোগসহ বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হই। আমার এই ধারাবাহিক দুঃসহ সময়ে আমার জীবনের বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সাথী আমার পত্নী লুৎফুন্নাহার বেগম ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট স্বল্পকালীন অসুস্থতায় পৃথিবী ছেড়ে আল্লাহ্‌র কাছে স্থিতিবান হন। দীর্ঘকাল ধরে এক ধরনের স্থবির জীবনে এবং আমার পত্নীর অকাল বিয়োগে এসব দুরূহ গবেষণায় ডুবে থাকাই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। এখানে একটা বিষয়ের প্রতি বিজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন যে, ক্ষেত্রবিশেষে পুনরুক্তিগুলো এসেছে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সূক্ষ্ম জটিল বিষয়গুলোর গুরুত্বের ঔজ্জ্বল্য তুলে ধরার

জন্য। সহজ কারণেই পৃথক পৃথক প্রেক্ষাপটে "তাকওয়া" এবং এই মহৎ গুণ অর্জনের লক্ষ্যে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের অনুসারীদেরকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখার সহজ আটপৌরে বর্ম হিসেবে "উসুলে সাবআ বা সপ্ত পদ্ধতির" উল্লেখ প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞ পাঠকদের আত্মসচেতনতা তাঁদের নিজেদেরকেই সমৃদ্ধতর করবে বটে। এই পুস্তক প্রকাশে অধ্যাপক জহুর উল আলম, মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান টুটুল, মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন, তানভীর হোসাইন, মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন, সঞ্জয় পাল, মোহাম্মদ সাখাইরুল ইসলাম প্রমুখের নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন এবং তাঁদের তাগিদপূর্ণ আগ্রহ আমাকে উৎসাহিত ও মুগ্ধ করেছে। রাব্বুল আলামিন তাঁদের সবাইকে কল্যাণ দান করুন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁদের শান্তি-সমৃদ্ধি দিন। আমিন!

মোঃ মাহবুব উল আলম
কুলসুমা ভিলা,
৩৪, চট্টগ্রাম সাংবাদিক হাউজিং সোসাইটি,
বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ–৪২১০।
ই-মেইল m.alam71@yahoo.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সুফি সভ্যতা : নৈতিক মানব ধর্মের স্বরূপ ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের গন্তব্য: সর্বজনীন সামাজিক সুবিচার, আদলে মোত্‌লাক্‌ ২৪

তৃতীয় অধ্যায়

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বিদ্যাবত্তা ৩৬

চতুর্থ অধ্যায়

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর দৃষ্টিতে রুহানিয়াত, রব্বানিয়াত, রবুবিয়াত ॥ নাস্তিক্যবাদের বিপরীতে'বেলায়তে মোত্‌লাকা' ৪২

পঞ্চম অধ্যায়

উসুলে সাবআ : তাকওয়ার মন্‌জিলে পৌঁছার সহজ সোপান ৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে প্রতিভাত তৌহিদী দর্শন ৬২

সপ্তম অধ্যায়

জাহেরী বাতেনী সব বিষয়ে নবিজীর (দ.) অবিনশ্বর বিশেষত্ব ও ব্যাপকতা প্রসঙ্গে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ৭২

দ্বিতীয় পর্ব

জীবনী-সংক্ষেপ

জ্ঞান ভাণ্ডার অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)
[জন্ম ১৮৯৩ইং–ওফাত ১৯৮২ইং] ৮৬

প্রথম অধ্যায়

বস্তুনিষ্ঠতার আলোকে নিরীক্ষণ ৮৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাহেরী পৃথিবীতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী এক দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী পদাতিক: রুহানী জগতে নিভৃতচারী ৯১

তৃতীয় অধ্যায়

তদীয় সাজ্জাদানশীন মনোনয়ন ১০৪

চতুর্থ অধ্যায়

একজন সুফি জীবন-যোদ্ধার দিনলিপি ১০৯

পঞ্চম অধ্যায়

আপন দর্পণে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১২১

পরিশিষ্ট ১৩৬

প্রথম অধ্যায়

সুফি সভ্যতা : নৈতিক মানব ধর্মের স্বরূপ

১. অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর জীবনের সর্বশেষ রচনা 'মানব সভ্যতা' পুস্তিকার 'ভূমিকায়' অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলেছেন:

"নৈতিক মানবতা যেই নীতিকে ধারণ করিয়া বাঁচে বা রক্ষা পায়, তাহার অপর নাম 'সুফি সভ্যতা' বা 'নৈতিক মানব ধর্ম'। ইহা মোটেই দেশগত বা সমাজগত গণ্ডিতে আবদ্ধ হইতে পারেনা।"

প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বাঁচিয়া থাকার একটি রীতিনীতি আছে। মানব সমাজের বাঁচিবারও নিশ্চয় একটি দিক নির্ণয়কারী রীতিনীতি আছে, যাহা মানবতা। মানবতা দেশ বা জাতির গণ্ডি মুক্ত। ইহা অভিন্ন।"

বলা বাহুল্য, দর্শন শাস্ত্রের সকল শাখার যথা জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology or theory of knowledge), প্রকৃতি বা জগৎতত্ত্ব (Philosophy of nature or the World), মন বা আত্মাতত্ত্ব (Philosophy of mind or Soul), স্রষ্টাতত্ত্ব বা আল্লাহ্তত্ত্ব (Philosophy of God): তথা জাগতিক তৎপরতার রসায়নের এটাই শেষ কথা।

এই ভূমিকায় তিনি আরো বলেন, "কাজেই বুঝিতে ও মানিতে হয় যে, মানব সৃষ্টির সঙ্গে ধৃতি-ধাতু বিশিষ্ট সভ্যতাও সনাতন এবং অবিনশ্বর। যদিও যুগপৎ দেশগত ও সংস্কৃতিগতভাবে গণ্ডি বুদ্ধিসম্পন্ন জনতার চক্ষে রঙিন চশমার মত বহুরূপ প্রতিভাত হয়। আমি এই সুফি সভ্যতা সম্বন্ধে আমার লেখা 'বেলায়তে

মোত্‌লাকা’ প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে নিজ ধ্যান-ধারণা-গবেষণার আভাস ব্যক্ত করিয়াছি। আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্যাবলি এবং গবেষণামূলক অন্যান্য বই-পুস্তকাদি ছাপাইয়া প্রচারমুখী করিয়াছি।”

২. অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর সংসার দর্শন তথা বাস্তব পার্থিব জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ আঁচ পাওয়া যায় তাঁর জীবনের সামাজিক-সাংগঠনিক অংশে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) শিক্ষা ও চর্চাকে অবলম্বন করে তিনি বাংলাদেশে সর্বজনীন কল্যাণমুখী অধ্যাত্ম অর্থাৎ তাসাওউফ মণ্ডল নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন, তার বাস্তব কর্মসূচি চালানোর জন্য তিনি ‘আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী’ নামে একটি সংগঠনের পত্তন করেন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। এই সংগঠনকে পদ্ধতিগতভাবে গতিশীল করার জন্য নিয়মানুযায়ী তিনি একটা গঠনতন্ত্র বা উপবিধি তৈরি ও প্রকাশ করেন ১৯৬৯ ইং তথা ১৩৭৬ বাংলা সনে। এই গঠনতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত Preamble বা প্রস্তাবনায় আল-কোরআন, নবিজী (দ.) ইসলামী জীবন দর্শন, তাসাওউফ এবং এই অধিক্ষেত্রে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের স্বরূপ আধ্যাত্মিক-সামাজিক লক্ষ্য বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে আল-কোরআনের হাওলা দিয়ে বলা হয়েছে: “বিচার-সাম্য রক্ষা করো, কেননা এটা ‘তাকওয়া’র মূল (ফা আদেলু ইন্না আদেলা যাত্‌ আত্‌-তাকওয়া)। একই সাথে বলা হয়েছে; “আমি তোমাদের মধ্যে বিচারসাম্য রক্ষার্থে আদিষ্ট হয়েছি”– (৪২:১৫)।

প্রস্তাবনায় তিনি আর্থিক বৈষম্য, অস্ত্রশক্তি তথা ‘ক্ষমতার’ উন্মত্ত আস্ফালন, ব্যক্তিগত বৈভব-লালসা-কুপ্রবৃত্তি-খাহেশের সমূহ উপদ্রবের মুখে বিচারসাম্য পদদলিত হবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন: “কার্যক্ষেত্র দেখা যায়; বিচারসাম্য, ধন-সঞ্চয় ও বণ্টনে বুঝ-ব্যবস্থা এবং সামাজিক মানের ব্যাপারে ধর্ম-প্রাধান্যতার বিভিন্ন মতবাদের গোঁড়ামির দ্বারা এই “আদ্‌লে মোত্‌লাক” বা বিচারসাম্য অতীতে মোকাইয়াদা যুগে নির্বিঘ্নে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই।[১] যেহেতু বিশ্বের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পারিপার্শ্বিকতায় এই মানবীয় সত্য-সত্তামানবোধ অস্ত্রবলের নিকট মাথা নত ছিল। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও জাতিগত কল্যাণকামী ইচ্ছা বা স্বাধীনতার মানবোধ পরিস্ফুটিত হইতে গৌণ বা দেরি ছিল। **নবুয়ত যুগ ব্যক্তি মর্যাদা উন্মেষ যুগ বিধায় ‘সর্বাত্মাক বেষ্টিত চেতনা’ আজকের পরিভাষায়**

Subjective ও Objective চেতনার Optimum বা ইপ্সিত স্তর দান করিতে স্বভাবতই দুর্বল ছিল। তাই 'অলল আখিরাতু খায়রুল্ লাকা মিনাল উলা' (নিশ্চয় সূচনা অপেক্ষা সমাপ্তি আপনার শ্রেয়) –কোরআনের বাণী মতে, অনন্ত স্থিতিশীল বেলায়ত যুগের চাহিদা মতে 'বেলায়তে মোত্লাকা' যুগের বিকাশ দান করিতে সমর্থ হয়। পাপীদের জন্য আশীষ স্বরূপঃ 'শফিউল মোজনেবিন রহমাতুল্লিল আলামিন' এর অমর হেদায়ত ধারা এই বেলায়তে মোত্লাকা যুগ পূরবী সূর্যের মতো বহু বিঘোষিত এক অলিয়ে কামেলের জাতে-পাকে ভৌগলিক মধ্যরেখার পূর্ব-পার্শ্বে প্রাকৃতিক বিশ্বদর্শন ভূমি, সাধনার পীঠস্থল চট্টলে বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব গাউসুল আযম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মালামিয়া কাদেরী (ক.) আল্লাহ্র বিশ্বজনীন আশীষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সর্বজনীন ঝামিলা মুক্ত সংসার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যদানকারী নিজ দৈহিক বা ভৌতিক আড়াল মুক্তি ও খোদা-সান্নিধ্যতায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই অতি-কামনার হাড়ভাঙ্গা মেহনতী যুগে সহজসাধ্য ও গ্রহণযোগ্য দেখা যায়, তাহারই প্রবর্তিত মুক্তিবাণী **"সপ্ত পদ্ধতি বা উসুলে সাবয়া"**।

৩. উসুলে সাবয়া :

মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই নফসানিয়াত, খাহেশিয়াত বা অনিয়ন্ত্রিত ভোগ প্রবৃত্তির উপাদান নিহিত। নফসানিয়াত-খাহেশিয়াতের সহজ অর্থ হচ্ছে 'আমার নিমিত্তে, আমার উদ্দেশ্যে, আমার লক্ষ্য অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি'– যা সর্বপ্রকার মূল্যবোধ, পরার্থপরতা, সর্বজনীন কল্যাণময়তা নষ্ট ও দূষিত করে দেয়। বিভিন্ন আচার-ধর্মের রকমারী লেবাস ও অভিব্যক্তি এবং এর বিপরীতক্রমে ধর্মীয় চেতনা ও দর্শন বর্জনপূর্বক স্রেফ বস্তু-ভোগবাদী কারবার শেষ পর্যন্ত সমগ্র মানবিক কল্যাণ দূরে থাক, এমনকি ঐ ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণ ও মানবিক বিকাশ সাধনে অক্ষম। সর্বজনীন কল্যাণমুখী মানবিক স্বভাব ও অভ্যাস রপ্ত করতে হলে আত্ম-সংশোধন অতীব প্রয়োজন। ইসলাম ধর্মের আদমীয় শেকড় থেকে শুরু করে নবিজী হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর জমিনে পত্র-পুষ্পে বিকশিত চিরসবুজ আদর্শিক 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা'-এর শীতল ছায়াতলে এই কল্যাণময়তার দূর্বাঘাসই জন্মায়। অন্যান্য ধর্মের দর্শন ও মানবিক কল্যাণময়তার কর্মযজ্ঞেও একই সুর ও ধ্বনি গুঞ্জরিত।

মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎসকাল থেকে এ যাবৎ যথার্থ মানব ও সুস্থ মানস গঠনে অগণিত পুস্তক বিরচিত হয়েছে। তবে সবার মর্মবাণী অন্তর্গতভাবে এক ও অভিন্ন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) 'উসুলে সাবয়া' অর্থাৎ সপ্ত পদ্ধতিকে অছিয়ে গাউসুল আযম সহজ-সরল বাংলা ভাষায় বিন্যস্ত করেছেন এভাবে:

১. "দেহ তত্ত্ব– পরদোষ পরিহার, নিজ দোষধ্যান পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন; যাহার ফলে খোদা পথচারী ছালেক হিংসা ও ঈর্ষা মুক্তিতে আত্মশক্তি সামর্থের প্রতি আস্থাবান ও সৎ রুজিতে সক্ষম হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে:- "ফানা আনিল খাল্‌ক।"

২. অনর্থ পরিহার– যাহা না হইলে চলে সেই কাজ কথা ও ব্যবহার পরিত্যাগ করা। যাহাতে মুক্তিকামী ব্যক্তি সংসার ক্ষেত্রে ঝামেলা মুক্ত, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সংসার জীবন যাপন ও পরকালীন নিশ্চিত স্বর্গের অধিকারী সাব্যস্ত যাহা কোরআনের বাণী। ছুফী পরিভাষায় বলে:- "ফানা আনিল হাওয়া।"

৩. স্রষ্টার ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ বাসনা-কামনার নত ভাব, যাহার ফলে লক্ষ্যহীন ব্যক্তির সত্য জ্ঞান উন্মেষ এবং মুর্খতার বিলোপ হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে:- "তছলিম" ও "রজা"। এই গুণাবলীতে প্রথম স্তরের সংসার আসক্ত কু-স্বভাব বর্জনে মুখ্য ব্যক্তিদের স্বভাব অর্জিত হয়।

৪. অধিকারলব্ধ বৈধ কাজে সংযম লাভ ও পাপ বিরত অভ্যাস মানসে বর্জন করা। যথা:- "রোজা" ইচ্ছাকৃত উপবাস। ছুফী পরিভাষায় বলে:- "তাকওয়া" স্রষ্টা ভয়। যাহার ফলে এই পথচারী সূক্ষ্ম জগতের সন্ধান-আলো পায়।

৫. পরের নিন্দাতে আত্মশুদ্ধি। যেহেতু নিজের অগোচর দোষের অবগতিতে দোষ মুক্তির সুযোগ, ফলে আক্রোশের পরিবর্তে বিশ্ববন্ধু ভাব লাভ হয়। ইহাতে উর্দ্ধ শক্তি জগতে নিজের শক্তি অর্জিত হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে:- "কালো মৃত্যু"।

৬. কামভাব এবং লালসা মুক্ত হওয়া। যাহার ফলে খোদা পথচারী ব্যক্তি "মুখ্য" বা অলি উল্লাহ্দের মধ্যে গণ্য হয়। ছুফী পরিভাষায় বলে:- "লাল মৃত্যু"।

৭. নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া। যাহার ফলে "ছালেক" অর্থাৎ খোদা পথচারী প্রভাব সম্পন্ন বেলায়তে খিজরীর অধিকারী হইবে। ইহাকে সুফি পরিভাষায় বলে :- "সবুজ মৃত্যু"।

সপ্ত পদ্ধতি ব্যক্তিকে, সম্প্রদায়, জাতি নির্বিশেষে মানবতা অর্জনে সহায়তা করে। মুক্তির দিশারী মনন প্রকৃতির সপ্তস্তর উন্নত মার্গে স্রষ্টাসান্নিধ্য দানের সহায়ক হয়। কামনা, বাসনা, অনর্থ ও অপচয় এবং ভৌতিক প্রেরণা আড়াল মুক্তিদান করে। সুতরাং, জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে সক্ষম যে, এই বেলায়ত বিশ্বজনিন ছুফী ধ্যান ধারণার প্রতীক তিনি একজন বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব গুণে গুণান্বিত বিধান শিথিল সকল ধর্ম শাস্ত্র গোঁড়ামী বিধান কঠোরতামুক্ত এবং "বেলায়তে মোত্লাকা" জামানার আরম্ভকারী, অতীত বিশ্ব বেলায়তের খোদা আনুগত্য বা সনাতন ইসলামের নৈতিক পূর্ণতাদানকারী।

এই উসুলে সাবয়া তাকওয়া অর্জনের সহজ পন্থা এবং মানুষকে এই অর্জনের পথে এগিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, 'সুফি সভ্যতা' তথা স্বচ্ছ শুভ্র 'মানব সভ্যতা' এবং এর ভিত্তি এই 'তাকওয়া' (সূত্রঃ বেলায়তে মোত্লাকা)।

৪. তাকওয়া এবং এর বিভিন্ন সোপান :

উন্নত মানব চরিত্রই সুফি সভ্যতা তথা মানব সভ্যতার ভিত্তি। এই লক্ষ্য ও সূত্রকে সামনে রেখেই নবিজী (দ.) ঘোষণা করেন, 'ইন্নামা বুইস্তু লি উতাম্মিমা মাকারিমুল আখ্লাক' (নিশ্চয়ই আমি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি : সুনানে ইব্নে মাজাহ্)।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর গঠনতন্ত্রের সূচনায় অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) একটা মহতী বাণীর রেফারেন্স দিয়ে লিখেছেন, "ফা আদেলু ইন্না আদেলু জাআতুত তাকওয়া (বিচারসাম্য রক্ষা কর, কারণ বিচার-সাম্যই তাকওয়ার মূল।" এই সামাজিক বিচারসাম্যই মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের ভিত্তি।

মানবসভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ এই তাকওয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত প্রয়োজন। আল-কোরআনের শুরুতেই সূরা বাক্বারার ২নং আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে: 'সন্দেহাতীত এই কিতাবটা মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক বা গাইড লাইন' (১:২)। অতএব, 'মুত্তাকীর' পরিচিতি জানা দরকার। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ- বেঁচে থাকা, কর্মে সতর্কতা অবলম্বন করা, আল্লাহ্ভীতি, পরহেযগারি, বিরত থাকা, রক্ষা করা, আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম প্রভৃতি। প্রচলিত অর্থে আল্লাহ্কে ভয় এবং তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনকে 'তাকওয়া' বলা হয়। 'বিপদ থেকে রক্ষা', 'সংশোধিত হওয়া' প্রভৃতি ক্ষেত্রেও 'তাকওয়া' শব্দ ব্যবহার হয়। একেবারে গড়পড়তা সাধারণ অর্থে 'তাকওয়া' মানে 'আল্লাহ্ভীতি'। মুহাম্মদী শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থেকে কোরআন-হাদিস প্রদর্শিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করাই তাকওয়া। মুহাম্মদ আলী থানভীর (মৃত্যু ১৭৪৫ খ্রি.) ভাষায়: "তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ শঙ্কিত বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা। শরিয়তের পরিভাষায় আদেশ মেনে চলা এবং নিষেধকৃত বিষয় ও কাজ থেকে বিরত থাকা। অন্য কথায়, পাপ থেকে এবং এর দিকে টেনে নেয়, এমন গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা।" সুফিগণের পরিভাষায় – "স্বীকৃত প্রসিদ্ধ অর্থে আল্লাহ্ ছাড়া যাবতীয় বস্তু থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া"। আরো সূক্ষ্ম অর্থে "অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকিছু অনুভব করতে না পারাই তাকওয়া।"

৫. মুত্তাকীর সংজ্ঞা :

আল-কোরআনে মুত্তাকীর সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে: "যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে; আর আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান রাখে এবং আখেরাতের প্রতি ইয়াকিন রাখে; তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম"– (২: ৩–৫)।

৬. তাকওয়ার বিভিন্ন সোপান :

মহান মুসলিম দার্শনিক মনীষী, বুজুর্গ ও সুফিগণ তাকওয়ার বিভিন্ন সোপান নির্ণয় করেছেন। হযরত ইমাম গাজ্জালীর (র.) মতে তাকওয়ার সোপান চারটি বিষয়: (ক) শরিয়তে যে সকল বিষয় বা বস্তু হারাম বলে নির্দেশিত হয়েছে,

আল্লাহ্‌র ভয়ে সেগুলো থেকে বিরত থাকা; (খ) শরিয়তে হারামকৃত সকল বস্তু থেকে বিরত থাকার পর 'সন্দেহযুক্ত' হালাল বস্তুগুলো থেকেও বিরত থাকা। নবিজী (দ.) বলেছেন, "যে বস্তু তোমাকে সন্দেহে ফেলে, তা বর্জন করো; আর যাতে তোমার সন্দেহ নেই, তা গ্রহণ করো"। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ হয়তো তোমাকে কিছু খেতে দিলো। এ খাদ্য ঐ ব্যক্তি হালাল উপার্জনে, নাকি হারাম উপার্জনে প্রস্তুত করেছে, তা তোমার জানা নেই। সুতরাং, সন্দেহ রয়েছে বলে তা তুমি গ্রহণ করলে না। এই শ্রেণির মুক্তাকীগণকে 'সালেহীন' বলা হয়; (গ) শরিয়ত মতে যাবতীয় হারাম বস্তু এবং সন্দেহজনক সকল হালাল বস্তু থেকে দূরে থাকার পর, আল্লাহ্‌র ভয়ে কিছু সন্দেহবিহীন হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা। নবিজী (দ.) বলেন, "যতক্ষণ কোন মুসলিম সন্দেহপূর্ণ বা সংশয়ে পতিত হবার আশংকায় সন্দেহবিহীন বস্তু বর্জন করবে না, ততক্ষণ সে খাঁটি মুত্তাকী হতে পারবে না"; এই শ্রেণির মুত্তাকীকে বলা হয়, আতকিয়া। (ঘ) উপরোক্ত তিন শ্রেণির তাকওয়া আয়ত্ত করার পর এমন সব হালাল বস্তুও সংযমমূলকভাবে পরিত্যাগ করা, যা ইবাদত-বন্দেগীতে সহায়ক নয়। এই মুত্তাকীগণকে 'সিদ্দিকীন' বলা হয়।[৩]

৭. প্রাচুর্যের দুনিয়ায় ক্ষুধা এক মর্মান্তিক দাগ: মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখে বাস্তবতার অভিন্ন উচ্চারণ :

আল-কোরআনে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যার যার পৃথিবীতে স্বল্পকালীন মানবজীবনকে কঠিন পরীক্ষাস্থলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সবার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্‌ নিজেই নিয়েছেন বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। বলা হয়েছে, "এমন অনেক জীব জন্তু আছে, যারা নিজেদের রিযিক সঞ্চিত রাখে না, আল্লাহ্‌ই তাদের রিযিক পৌঁছিয়ে দেন, আর তিনি তোমাদেরও রিযিকদাতা (২৯ : ৬০)। আরো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে : "অতঃপর তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অটল পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, পৃথিবীকে বরকতময় করেছেন এবং তাতে সব সৃষ্টির জন্য সমভাবে প্রত্যেকের (চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণ মতো) খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত রেখেছেন (৪১ : ১০)।" রিযিকের গ্যারান্টি সম্পর্কে আরো নিশ্চিত করে বলা হয়েছে : "আর পৃথিবী, তাকে আমি বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্‌গত করেছি সুপরিমিতভাবে এবং তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা

নও, তাদের জন্যও; আমার নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর খাজিনা (ভাণ্ডার) এবং আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি (১৫ : ১৯-২১)। জীবিকা দান ও সরবরাহ সবার জন্য অবারিত বর্ণনা করে আল-কোরআনে জানানো হয়: "আপনার রব্ এদেরকেও এবং তাদেকেও (দুনিয়াবী জীবনে) তাঁর দান দ্বারা সাহায্য করেন এবং আপনার রব-এর দান অবারিত (১৭ : ২০)।" "দুনিয়ায় যদি কেউ অনাহারে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তার হক্ব অন্য কেউ অন্যায়ভাবে গ্রাস করছে–" এই হাদিসের সূত্র ধরে ভারতের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞ অধ্যাপকের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় এবং পৃথিবীতে বিবিধ প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন গত বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে।

পৃথিবীতে অঢেল খাদ্য সামগ্রী নিত্য বর্ধনশীলভাবে উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও বণ্টন এবং ভোগ ব্যবস্থায় চরম সামঞ্জস্যহীনতা, মারণাস্ত্র নির্মাণে অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা সেই অতীত থেকে আজ (২০২৪ খ্রি.) পর্যন্ত অনিত্য এ পার্থিব জীবনকে জাহান্নামে পরিণত করে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে মহাসচিব আন্তেনিও গুতেরেসের বক্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতে আল-কোরআনে প্রদত্ত রিযিকের গ্যারান্টি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার অপকর্মের সত্যতা ঝিলিক মেরে উঠেছে। তিনি বলেন, "প্রাচুর্যের এই দুনিয়ায় ক্ষুধা মানবতার উপর এক মর্মান্তিক দাগ এবং মহাকাব্যিক এক মানবাধিকার লংঘন। বিশ্বের কোটি মানুষকে অনাহারে-অর্ধাহারে রাখার বিষয়টা দীর্ঘদিনের বাস্তবতা। এসডিজি (জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) শুধু কিছু লক্ষ্যের তালিকা নয়। এগুলো অগুনতি মানুষের আশা, স্বপ্ন অধিকার এবং প্রত্যাশা। সারা বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট দূর করতে একটা বৈশ্বিক উদার পরিকল্পনা দরকার।" ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ২০১৫ খ্রি. এসডিজি নির্ধারণ করা হয়। অথচ গত আট বছরে অর্জন মাত্র ১৫ শতাংশ। জাতিসংঘ মহাসচিব 'চরম দারিদ্র্য এবং পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, সবার জন্য বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন এবং মোটামুটি মানুষের কাজের সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়গুলোতে সার্বিক কার্যক্রম চলছে জানালেও কিছু ক্ষেত্রে অবনতির বিষয়ে সতর্কও করে দেন।[৪]

উল্লেখ্য, বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) হাওলা দিয়ে ধনবৈষম্য, ধনতন্ত্র, ভোগবাদের মূল উৎপাটন করে ধনসাম্য উৎসাহী নীতি অনুসরণ করে বিশ্বশান্তির পথে পৃথিবীকে এগিয়ে নেবার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

টীকা:

১. 'মোকাইয়াদা যুগ' ঐতিহাসিকভাবে খোলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী পুরো সময়টা জুড়ে বিস্তৃত। খোলাফায়ে রাশেদার সময়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রজাতান্ত্রিক, সমতাবাদী, সব সম্পদের উপর গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক নিয়ন্ত্রণ কায়েমের যে কর্মসূচি নেওয়া হয়, তা হযরত আলীর (ক.) নির্মম শাহাদাতের পর স্তব্ধ হয়ে যায়। বরং, সমকালে প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তিশালী রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্য ও রাজশক্তির অনুকরণে ব্যক্তিগত, শাসন ও পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বায়তুল মাল' জবরদস্তিমূলক শাসকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। 'রাজতন্ত্রী শাসনের অধীনে সরকারি পদে থেকে সুষ্ঠু বিচারকার্য সম্ভব নয়'– বিধায় ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (র.) উমাইয়া বংশীয় শক্তিশালী শাসক আল-মনসুরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে তাঁকে কারাভোগ, অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন ও শেষ পর্যন্ত বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ইমাম আবু হানিফা-অসিয়ত করে যান যে, 'আল-মনসুর জনগণের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করে বাগদাদের যেই এলাকায় শহর নির্মাণ করেছেন, সেই এলাকায় যেনো তাঁকে দাফন করা না হয়। কারাভ্যন্তরে সিজদাবনত অবস্থায় ইন্তিকাল করলেও শাসকগোষ্ঠীর রক্ষীরা তাঁর মৃত্যুকে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' বলে অপপ্রচার চালায়। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, 'তৎকালীন বিশিষ্ট আলেমগণের মধ্যে সম্ভবত তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা বিত্তবানদের হাদিয়া-তোহ্‌ফা প্রাপ্তির পরোয়া না করে নিজ ব্যবসায়িক উপার্জনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, 'ইলমের সেবা এবং তাঁর নিকট সমবেত গরীব শিক্ষার্থীদের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করার ব্যবস্থা করতেন। এই ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত এমন মহৎ প্রতিবাদের দ্বিতীয় কোন নজীর নেই।

২. এই অবস্থা বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বের সর্বত্র সব দেশে প্রচণ্ড হিংস্রভাবে বিদ্যমান।

৩. কিমিয়ায়ে সাআদাত: হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.); ইসলামী পরিভাষা, ড. সৈয়দ শাহ ইমরান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৪. দৈনিক ইত্তেফাক-ঢাকা; ২০.০৯.২০২৩ইং (সূত্র : ডয়েচে ভেলে)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের গন্তব্যঃ সর্বজনীন সামাজিক সুবিচার, আদলে মোত্‌লাক্

১. সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাই মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের উদ্দিষ্ট :

আদলে মোত্‌লাক বা সর্বজনীন সামাজিক বিচারসাম্য অর্থাৎ সামাজিক সুবিচার (Social justice) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের অভিযাত্রা। এই বেলায়তের মহান ভাষ্যকার অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর সাংগঠনিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ-ফটক হিসেবে নির্মিত 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর' গঠনতন্ত্রের একবারে সূচনাতেই এই লক্ষ্য আল-কোরআনের উদ্ধৃতি সহকারে নির্ণয় করে বলেছেন; 'ই-দিলু হুয়া আকরাবু লিত্‌তাকওয়া'– 'সুবিচার করো, ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী'– (৫ : ৮ আয়াতাংশ)।

এই আয়াতের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন আরেকটা সমলক্ষ্যাভিসারী আয়াতঃ "ওয়া উমিরতো লিআদিলা বাইনাকুম"– আমি তোমাদের মধ্যে বিচারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট হয়েছি– (৪২ : ১৫)।

এর সাথে তিনি গঠনতন্ত্রের সূচনাতেই একটা মহতী বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন : "ফা আদেলু ইন্না আদেলু জাআতুত্ তাকওয়া" (বিচারসাম্য রক্ষা কর, কারণ বিচারসাম্যই তাকওয়ার মূল)। বিচারসাম্য তথা সামাজিক, আর্থিক প্রভৃতি জাগতিক সর্বক্ষেত্রে বিচারসাম্য প্রতিষ্ঠাপূর্বক আপেক্ষিক সমতাবাদী শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠাই মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের উদ্দিষ্ট। এই সামাজিক সুবিচারকে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের পরিভাষায় 'আদলে মোত্‌লাক' বলা হয়।

আল-কোরআনের এসব আয়াতের অনুগামী হয়ে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) চেতনা, শিক্ষা ও দৃষ্টান্তমূলক কাজ-কর্মের আলোকে অছিয়ে গাউসুল আযম তাঁর 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেন: "এই বেলায়তে মোত্‌লাকার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব মানবতার জন্য স্রষ্টা অনুমোদিত শান্তিধারা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ধন-সঞ্চয় ও বণ্টনে বা ধর্মকে 'চতুর জনের ব্যবসা' রূপ দেওয়ার ফলে যাহারা ধর্মবিমুখতা বা নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, তাহাদের জন্য ইহা একটি উত্তেজনাবিহীন পন্থা এবং এই বেলায়তে মোত্‌লাকা বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণধর্ম দিশারী। ইহা ধনতন্ত্র ও নাস্তিকতাবাদের মূল উৎপাটনকারী, ধনসাম্য উৎসাহী বিশ্ব শান্তির প্রতীক। কোরআন– "দুলাত" অর্থাৎ অতি সঞ্চয়কে পছন্দ করেন না (সূত্রঃ সূরা হাশর, ৫৯ : ৭)। ইহাতে সাদা-কালো বর্ণ বৈষম্য বা আঞ্চলিকতার কোন প্রশ্ন নাই। বরং ইহা সর্বজনীন ব্যবস্থা এবং সর্বহারাদের জন্য সুবিচার বাণী।"

আল-কোরআনের পার্থিব আর্থ-সামাজিক-নীতির নির্যাস আহরণ করে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সাদা-মাটা চট্টগ্রামী ভাষায় বলতেন, "দুনিয়া মোছাফেরীর জায়গা, এখানে আড়ম্বরের দরকার কী?"

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে এই অপরিহার্য সামাজিক বাস্তব বিষয়টাকে প্রক্ষেপণ করে বলেন– "হজরত আকদাছ, আড়ম্বরমূলক খুশি পছন্দ করিতেন না। কেহ শাদী শব্দ উল্লেখ করিয়া বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করিলে বলিতেন, "রসূলুল্লাহ্ এই জগতকে 'দারুল হাজান' পেরেসানীর স্থান বলিয়াছেন, তুমি আমাকে খুশি শুনাইতে আসিয়াছ"!

অতএব প্রমাণিত হয় যে, এই বেলায়তে মোত্‌লাকার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ব মানবতার জন্য স্রষ্টা অনুমোদিত শান্তিধারা। "প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ধন সঞ্চয় ও বণ্টনে বা ধর্মকে চতুরজনের ব্যবসা রূপ দেওয়ার ফলে যাহারা ধর্ম বিমুখ বা নাস্তিকতার দিকে ঝটুকিয়া পড়িতেছে, তাহাদের জন্য ইহা একটি উত্তেজনাবিহীন পন্থা এবং এই বেলায়তে মোত্‌লাকা বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণধর্ম দিশারী। ইহা ধনতন্ত্র ও নাস্তিকতাবাদের মূল উৎপাটনকারী, ধনসাম্য উৎসাহী বিশ্ব শান্তির প্রতীক।"

২. ইসলামী সুফি সভ্যতাই প্রকৃত কল্যাণকামী মানবসভ্যতাঃ বেলায়তে মোত্লাকা'র উপপত্তি (Inference) :

এই গ্রন্থে আরো বলা হয়, "ইসলামী ছুফী সভ্যতাই প্রকৃত কল্যাণকামী মানব সভ্যতা। যেহেতু এই ছুফী সভ্যতার ধারক-বাহক ব্যক্তিগণই অন্তর-বাহির পাক-পবিত্রকামী ও অকৃত্রিম। অযথা পরিত্যাগ নির্দেশকারী, নিরাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যাসকারী, আচার-শুচি এবং পরশ্রীবিমুখ; স্বাধীন জীবনযাপনে আগ্রহশীল স্রষ্টাধর্ম উন্মুখ ও "আম্মারা" বা কামনা প্রবৃত্তি মুক্ত। সৃষ্টিকে যথাযথ ব্যবহারে "রহমান ও রহীম" খোদাগুণজঃ প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ। বিশ্বের বিভিন্ন জনগণ এই খোদায়ী প্রাকৃতিক দানের অপব্যবহারের ফলে দুর্যোগ ও দুঃখ কষ্টকে সম্পদের মোহে বাড়াইয়া চলিয়াছে, যাহার পরিণাম ভয়াবহ হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে অপ্রয়োজনীয় কামনায় অসভ্য যুগের নিদর্শনরূপী ভূষণকে ফ্যাশন মনে করিয়া মানব অলক্ষ্যে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন শরীর গোদান, অলঙ্কার প্রিয়তায় নিজ শরীরছেদ কষ্ট ও হাতে পায়ে গলায় নানা অলঙ্কার বরণ করিয়া লয়। আদিম আফ্রিকানদের মধ্যে গ্রীষ্মকালে দিন দুপুরেও বাঘের চামড়া গায়ে পরিধান করিয়া গর্ব ভরে বিচরণ করার রেওয়াজ ছিল।

আধুনিক অঙ্গ বিকৃতকারী পোষাক পরিচ্ছদ, অনিষ্টকারী আমোদ ও চরিত্র বিনষ্টকারী প্রমোদ এক স্বাস্থ্য হানিকর পানপ্রিয়তা ও বেশভূষার "বালা" বিশেষ।

অযৌক্তিক আচার ধর্ম মোহ, নোংরা ও স্বাস্থ্যবিরোধী হাল-চাল মানবতার ধর্মকে কলুষিত করে বিধায়, আচারে-বিচারে অজ্ঞতাজনিত গর্ব ও অহমিকার বিকাশ পায়। পবিত্র কোরআনে যাহাকে "মারহান" উৎফুল্ল "ফাখুরান" গর্বকারী বলিয়া নির্দেশ আছে। ফলে মানব প্রকৃতি কঠোর ও নিষ্ঠুর হওয়ার দরুণ মানব আত্মার কোমলগুণ বিলুপ্তিতে "আম্মারা" বা কামনা প্রবৃত্তি প্রাধান্য হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জিত পশুসুলভ অসভ্য সাব্যস্ত হইতে বাধ্য। তাই ধর্ম আনুগত্যতা অনিবার্য্য।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই ইসলামী ছুফী সভ্যতা বিশ্ব মানব কল্যাণকামী নির্ভরযোগ্য মানবীয় সভ্যতা। বিশ্ব মানবতার কাণ্ডারী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর রহস্যের ধারক-বাহক, ছুফী সভ্যতার দিশারী মহাপুরুষদের বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব স্রষ্টা-প্রেমজ মূর্তিতে মূর্ত এবং দুর্নীতি নিবারণে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

করিতে সমর্থ। যেহেতু মহানুভবতাই মানবতা। এই মহানুভবতার অপর নাম মানবের সূক্ষ্ম স্রষ্টা-বোধ শক্তি।

এই স্থুল দৃশ্য জগতের অস্তিত্বের প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, সূক্ষ্ম "পরমাণুর" অপর বিকাশ নাম "অণু"। এই অণুর ক্রমবিকাশই বস্তু, পদার্থ, উদ্ভিদ, বীজ ও কীট। এই ক্ষুদ্র কীটের নূতনত্বই জীব, পশু এবং শ্রেষ্ঠরূপ মানব। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, আদতে সূক্ষ্ম শক্তিই মূল।

ক্ষুদ্র বালুকা কণা যেমন দর্পণ বা আয়নার যোগ্যতা রাখে তদ্রূপ এই মাটির সৃষ্টি মানবও সূক্ষ্ম শক্তি সুগুণ সম্পন্ন "ফেরেশ্‌তা" 'ধনাত্মক' আনুগত্য প্রকৃতি সম্বলিত এবং নিজ সূক্ষ্ম শক্তি বিমুখ স্থুল পারিপার্শ্বিক প্রভাবমুক্ত 'ঋণাত্মক' বিরোধ প্রকৃতি সমন্বয়ে ব্যক্তি ও গণ্ডি এবং ব্যাষ্টি প্রভাব শক্তি সম্পন্ন স্রষ্টা গুণজ দর্শনযোগ্য শক্তিশালী জীব। পালক, বর্ধক, পরম সূক্ষ্ম আল্লাহ্ গুণজঃ। তাই এই মহাশক্তির আত্ম বিকাশই "এরফান" পরিচিতি, মানবতা–সৃষ্টি সাফল্য নির্বাণ বা লয়। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এই সূক্ষ্ম শক্তির ধ্যান ধারণার সাধক ছুফী মনিষীরাই অল্পে সন্তুষ্ট, আত্মনির্ভরশীল, নির্বিলাস ও সৎরুজী সম্পন্ন। অনর্থ বা উপকার বিহীন বস্তুকে এড়াইয়া চলে। পরদোষ পরিহার এবং নিজ দোষ ত্রুটি সজাগ, অহম মুক্ত স্রষ্টা অনুগত। ফলে মূর্খ যুগাচার ও পশুত্ব দোষ বিবর্জ্জিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত নিষ্কাম প্রেমজঃ মূর্তি বিশ্ব প্রেমিক। প্রজ্ঞাবাণী (কোরান) সূরায়ে হাদীদ ১৬–১৭ আয়াতের ইঙ্গিত দ্রষ্টব্য। তাই পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) বলিয়াছিলেন, "আমি ধর্মের পুনঃ জীবন দানকারী। 'এলহাম' 'এলকার' দ্বারা মানব ধর্মকে বেলায়ত আলোতে আলোকিত করিয়া বিধান ধর্মের বিরোধাত্মক খারাপি দূরকারী জীবন দাতারূপে আসিয়াছি।"

অতএব, তিনি গাউছে আজম এফতেতাহিয়া–আরম্ভকারী, মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী শরীয়ত প্রাধান্য। কারণ সেই সময়টি মোস্‌লেম হুকুমত প্রাধান্য ছিল। গাউছুল আজম মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহ্মদ উল্লাহ্ (ক.) বিকাশ লাভ করেন ১২৪৪ হিজরীতে। তৎপূর্বের "ছুফীজম" নামে ব্যবসাধারী পীরী সম্প্রদায়ের খারাপি দূরকারী হিসাবে এবং বিশ্বের বিধান ধর্ম শিথিল যুগে বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্বে বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহ্মদী রূপে।

এই হিসাবে দেখা যায়, নবুয়াত জমানার পর আচার-ধর্ম প্রাধান্য যুগে হজরত শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) কেবলাই নবুয়াতের পরবর্তী কালের দীর্ঘতার অজুহাতে মত-বিরোধ যুগের অবসান ঘোষণা করেন। "সমস্ত খোদা-প্রেমিক বন্ধুগণ আমার পদাঙ্ক অনুসারী, আমি পূর্ণচন্দ্র নবির পদাঙ্ক অনুসারী" বাণীতে এই দাবী প্রমাণ করে যে, মানবতার বিকাশ ক্ষেত্রে ইহা সাম্যের একটি বৃহত্তম যোগ্যতার দ্বার উন্মেষকারী, যাহা ত্রাণ কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গাউছে আজমীয়তের দ্বার উন্মোচনকারী বেলায়ত। নবুয়াত ও বেলায়তের যুগল যোগ্যতা সম্পন্ন। বিধান-শিথিল যুগে এই যুগল যোগ্যতা; ব্যক্ত-"জাহের" অব্যক্ত-"বাতেন", এলম, এলহাম ও অলৌকিকতার প্রভাবে বিশ্বজনীন বেলায়তে মোত্‌লাকার বিকাশ লাভ হয়। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলিয়াছিলেন, রসূলে করীমের দুইটি টুপীর মধ্যে (বেলায়তী সম্মানী তাজ দুইটির) একটি আমার মাথায় অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর দস্তগীর ছাহেবের মাথা মোবারকে রাখিয়াছেন"। ইহাতে বুঝিতে কষ্ট হয়না যে, বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর তাজ পীরানে পীর শাহে বাগ্দাদী এবং বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহ্‌মদীর তাজ তাঁহার মাথা মোবারকে প্রতিষ্ঠিত। তাই বিশ্বের অন্য কোন খোদা পেয়ারা ব্যক্তি এই গাউছে আজমীয়তের দাবী করেন নাই এবং করান নাই। যেহেতু এই সম্মান প্রতীক, শেষ নবির নবুয়তী নাম মোহাম্মদ এবং বেলায়তী নাম আহ্‌মদ নামদ্বয়ের সম্মান প্রতীকই ছিল।

শত কলমে একটি সূর্য্য এমনি ভাবে ঝুলে,
দোজাহানের বাদশা আজি ফকির বেশে চলে।

অতএব, এই বেলায়তে মোত্‌লাকা, বিশ্ব মানবতার কল্যাণ-ধর্ম দিশারী পরম ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন। কারণ; বিশ্ব সভ্যতা যেইভাবে কামনা বাসনা, অনর্থ অপচয়ের স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তৎমুক্তির জন্য এই ছুফী সভ্যতার নীতিমালা 'সপ্ত পদ্ধতির' অনুসরণ অনিবার্য।

কোরআন বাণী ঃ "তোমরা ধ্বংসের সন্নিকট হইলে খোদা তোমাদিগকে রক্ষা করেন এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন"। **যাহাকে কোরআনী ভাষায় "আদলে মোত্‌লাক" বিশ্ব জাতির পরিভাষায় বিশ্ব-সাম্য এবং আইন শৃঙ্খলার পরিভাষায় বিচারসাম্য বলে**। আল-কোরআন বলেন, "তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র

‘রজ্জু’ দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্‌ উহা হইতে তোমাদের রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎপথ পাইতে পারো। তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দেবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করিবে, ইহারাই সফলকাম। তোমরা তাহাদের মত হইওনা, যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে (৩ : ১০৩–১০৫)

ওহে বেলায়তে মোত্‌লাকার মশালধারী নৈতিক মহাপুরুষ! বর্তমান অতি সঞ্চয় প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুগে মোহাচ্ছন্ন মানবের দিশারী হিসাবে তোমার আলোকবর্তিকা নিয়ে আগাইয়া আস।

কাফেলা অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছে। ঐ পিছনের কাফেলার ক্ষীণ আওয়াজ শুনা যাইতেছে।

ওহে অহিংস নীতির বাহক! তুমি তো নৈতিকতাপূর্ণ আধুনিকতাকে হিংসা করনা। বিধান ধর্মের বেড়াজাল ঠেলিয়া সামনে অগ্রসর হও।

ওহে নির্বিলাস পরশ্রীকাতরতা মুক্ত কামনাহীন মোজাদ্দেদে জমানা! তুমি বাসনা-কামনা মুক্ত খোদা-সন্তুষ্ট অলীয়ে কামেল। তোমার রূহানী তাছার্‌রোফাতের প্রভাবে ধাঁধায় পতিত মানবের অন্তর চক্ষু উন্মেলিত করিয়া অনন্ত জীবন লাভে সহায়তা কর।

ওহে পরমত সহিষ্ণু ধৈর্য্যশীল শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষাকারী “ছায়েম” খাতেমুল অলী! ওহে সপ্তগ্রহ কবল মুক্ত জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ! তোমার অনাড়ম্বর ফাছাদ পরিহারকারী, জীবনাদর্শকে মোহগ্রস্ত মানব সন্তানের সামনে তুলিয়া ধর। ওহে পাপকার্য্য বিরত প্রতিশোধ বিমুখ গাউছুল আজম! হিংসা-নিন্দা, প্রশংসা বা লাভ লোকসান তোমাকে বিচলিত করিয়া খোদা-স্মরণ বিচ্যুত করিতে পারেনা। তোমার স্বাধীন ও মহান বেলায়তের ধ্বজা হাতে কাফেলার অগ্রনায়ক হিসাবে

অগ্রসর হও। তুমি তৌহীদে আদ্য়্যানের ধারক ও ধর্মসাম্যের পোষক। তোমার রহমত হইতে কেহই বঞ্চিত হইবে না।

তুমি রসূলুল্লাহের উত্তরাধিকারী অগ্রনায়ক হিসাবে উপস্থিত না থাকিলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না। তোমার উপস্থিতিই খোদার রহমত। ইহার সাক্ষী পবিত্র কোরআনঃ– "আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তুমি তাহাদের মধ্যে থাকিবে, অথচ তিনি তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, অথচ তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন"– (সূরা আনফাল ৮ : ৩৩)।
ওহে বিশ্বঅলী! বিপদগ্রস্ত বিশ্ব, তোমার ফজিলতে রব্বানীকে কামনা করিতেছে। তুমি দর্শন ও ফয়জে রহমত দানে কৃতার্থ কর।

গোলাকার পৃথিবীর বৃত্তে প্রদক্ষিণ রত মানবসন্তান তোমার পিছনে ঘুরিয়া আসুক, একের পর এক শৃঙ্খলিত কাতারবন্দি ভাবে।"

৩. তৌহিদ : আদলে মোত্লাক বা সর্বজনীন বিচারসাম্য প্রতিষ্ঠার বীজ :

ইসলাম এসেছে নিরঙ্কুশ তৌহিদেরই বাণী নিয়ে যা হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহিম (আ.) থেকে হযরত ঈসা (আ.) এবং নবুয়ত-রিসালত পর্যায়ের টার্মিন্যাল বা সমাপ্তি প্রান্তবিন্দু হযরত মুহম্মদ (দ.) ও তাঁর শরিয়তে এই তৌহিদই মূল ভিত্তি হিসেবে প্রোথিত এবং এই একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তা সকল প্রকার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, যৌক্তিকভাবে যথার্থ বলে সমগ্র বিশ্বে সর্বজনস্বীকৃত। সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন **মৌলিক বিষয়াদিতে অভিন্নতা**। তাই আল কোরআনে অতি সহজ ভাষায় সূরা আন্-নিসার সূচনাতেই ঘোষণা করা হয়েছে, "হে মানবজাতি, নিজেদের রবকে ভয় করো (ইত্তাকুও), যিনি তোমাদেরকে অভিন্ন নফ্স (নফ্সে ওয়াহেদাত) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা থেকে তার সাথী বা জুড়ি (Mate) সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন এবং আল্লাহ্কে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা করো; আর তোমরা মাতৃগর্ভকে (আল্ আরহাম) [অর্থাৎ জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করাকে] ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন (৪ : ১)। উল্লেখ্য, নফ্স শব্দের অর্থ হিসেবে বাংলায় অন্যান্য শব্দের পাশে 'প্রাণসত্তা' শব্দটাও ব্যবহৃত হয়; যা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক থেলিস

(৬২৪−৫৪৭) খ্রি. পূ.) 'অদৃশ্য Life-germ' বলে অভিহিত করেছিলেন। অবশ্য নিরেট বাস্তবতা তাঁর ধারণারও অনেক বাইরে।

আল-কোরআনের এই আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, মানবজাতি এক পরিবার, এক জ্ঞাতির অন্তর্ভুক্ত। সুবিচারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অভিন্ন সমতার প্লাটফর্ম অপরিহার্য। এ সম্পর্কে পবিত্র সহীহ্ হাদিসে বলা হয়েছেঃ "সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহ্র পরিবার, কারণ ইহাকে তিনিই প্রতিপালন করেন। অতএব, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয়পাত্র, যে আল্লাহ্র পরিবারের মঙ্গল সাধন করে।" এই মহান হাদিসে কেবল মানব জাতিকে নয়, সমগ্র সৃষ্টিকে অভিন্ন সমতলে স্থাপন করা হয়েছে। সুবিচার, বিচারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটাই অপরিহার্য এবং ইনসাফের ভিত্তি বা Pedestal.

এখানে লালন শাহের একটি গানের কয়টি চরণও উল্লেখ করা যায়− "পুরুষ বলতে কুম্ভভারি/এক বীজে হয় পুরুষ নারী/বারিতে সৃষ্টি কারবারি/এক ফুলে দুই রং ধরায়" (গান নং ৭৪৫, টীকা নং ৩ দ্রষ্টব্য)।

৪. ন্যায় বিচারের ন্যায্যমান প্রতিষ্ঠা :

আল-কোরআনে সূরা আরাফ এবং সূরা শুরার দুটো আয়াতে যথাক্রমে বলা হয়েছে : "বলুন, আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায় বিচারের ন্যায্যমান প্রতিষ্ঠার" (৭ : ২৯)। সূরা শুরার ১৫নং আয়াতাংশে বলা হয়েছেঃ 'বলুন, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ই আমাদেরকে একত্রিত করবেন। এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট (৪২ : ১৫)। এই সূরা মক্কী মধ্যগ্রুপের সূরা এবং তা নাযিল হয় ৬১৫/৬১৬ খ্রি. আবিসিনিয়ায় গণ-হিজরতের প্রাক্কালে। এর আগে প্রতিপক্ষগণ শেয়ারে উপাসনার প্রস্তাব দিলে নাযিল হয় সূরা কাফিরুন, যার শেষ আয়াত; "লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন" (তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার) (১০৯ : ৬)। ভিন্নমত পোষণকারীদের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ তফাৎ ও দূরত্ব বজায় রেখে সংঘাতবিহীন অবস্থানের ঘোষণা হিসেবে এই আয়াত যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনো

হচ্ছে। আধুনিক বহুত্ববাদী, সমাজবাদী রাজনীতিবিদরাও এই আয়াতকে ফর্মূলা হিসেবে ব্যবহার করতে তৃপ্তিবোধ করেন। দর্শনবেত্তারাও ধর্মীয় সংঘাতবিহীন সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে এই মহৎ আয়াতকে মানদণ্ড হিসেবে প্রয়োগ করে স্বস্তি পান। এ প্রসঙ্গে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ইতিহাসের সকল পর্যায়ে বিন্যস্ত নীতিমালার প্রতি মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবতীর্ণ একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে: **"আমি আপনার প্রতি সত্যগর্ভ কিতাব নাযিল করেছি; এর পূর্বে নাযিলকৃত কিতাব প্রত্যয়নকারী ও সংরক্ষণকারীরূপে; সুতরাং আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুসারে আপনি তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন এবং যে সত্য আপনার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির তাবেদারী করবেন না; আমি আপনাদের প্রত্যেকের জন্য শরিয়ত ও মিনহাজ স্থির করে দিয়েছি। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং, সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহ্র নিকটেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে ইখতেলাফ করছিলে, সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করবেন। অতএব, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, সেই মানদণ্ডে আপনি তাদের মূল্যায়ন করুন, তাদের প্রবৃত্তির তাবেদারী করবেন না, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন, যেন তারা আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তার কিছু থেকেও আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে। অনন্তর যদি তারা না মানে, তবে জেনে রাখুন যে, তাদের কোনো কোনো পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান, আর মানুষের মধ্যে অনেকই তো ফাসেক (সত্য ত্যাগী)। তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহ্র চেয়ে অধিক উত্তম কে? (৫ : ৪৮-৫০)।**

এই তিন আয়াতের পূর্ববর্তী পাঁচ আয়াতে (৫ : ৪৩-৪৭) তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাওরাতে হেদায়েত ও নূর ছিল, আর আল্লাহ্র অনুগত নবিগণ, রব্বানীগণ ও বিদ্বানগণ ইহুদীগণকে তদনুসারে বিধান দিয়েছেন। কারণ, তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। অতএব, মানুষকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো, আর আমার আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। আর আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন,

তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই তো কাফির। এর পরবর্তী ৪৫নং তাওরাতে প্রতিশোধ বা কিসাস গ্রহণের মাত্রার বিবরণের পর ক্ষমাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এরপর পরবর্তী ৪৬নং আয়াতে বলা হয়, ঈসা ইবনে মরিয়মকে তাঁর পূর্বে নাযিলকৃত তাওরাতের প্রত্যয়নকারীরূপে তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের প্রত্যয়নকারীরূপ এবং মুত্তাকীদের জন্য পথ-নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জিল দিয়েছিলাম, উহাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো। ৪৭নং আয়াতে বলা হয়, 'ইঞ্জিন-অনুসারীগণ যেন, আল্লাহ্ উহাতে যা নাযিল করেছেন, তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসেক।'

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদে সূরা মায়েদার ৪৪ থেকে ৫০ আয়াতে আল্লাহ্র কিতাব থেকে বিচ্যুতদের বিবরণ এবং ঐ বিচ্যুতি-ভ্রান্তি থেকে সতর্ক থাকার জন্য আল-কোরআনে নবিজীকে (দ.) সতর্ক সংকেত প্রদান করা হয়েছে। এখানে মোটা দাগে একটা বিষয় প্রতিভাত যে, **সামাজিক সুবিচারের রূপরেখা তাওরাত থেকে আল-কোরআন পর্যন্ত নীতিগতভাবে অভিন্ন**।

৫. আল-কোরআনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য :

আল-কোরআনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য পৃথিবীতে ন্যায়ানুগ সুবিচারপূর্ণ, নৈতিকতাপূর্ণ টেকসই সামাজিক শৃঙ্খলামণ্ডিত আচরণবিধি প্রতিষ্ঠা করা (To establish a viable Social order on Earth that will be just and ethically based)। সমকালীন আরব তথা সমগ্র বিশ্বে কল্পিত উপাস্য বস্তুকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বেপরোয়াভাবে যে-কোন পন্থায় সম্পদ আহরণ ও ভোগ-বিলাসের যে বন্যা প্রবাহিত ছিল, তা রোধ করতে মানব সমাজে অবতীর্ণ হয় আল-কোরআন।

"The Qur'an's goal of an ethical, egalitarian social order is announced with a severe denunciation of the economic disequilibrium and social inequalities prevalent in contemporary commercial Meccan society. The Qur'an began by criticizing two closely related aspects of that society: the polytheism or multiplicity of gods which was symptomatic of the segmentation of society, and the gross socio-economic disparities that equally rested on and perpetuated a pernicious divisiveness of mankind. The two are

obverse and converse of the same coin: only God can ensure the essential unity of the human race as His creation, His subjects, and those responsible finally to Him alone. The economic disparities were most persistently criticized, because they were the most difficult to remedy and were at the heart of social discord although tribal rivalries, with their multiple entanglements of alliance, enmity, and vengeance, were no less serious, and the welding of these tribes into a political unity was an imperative need. Certain abuses of girls. orphans, and women, and the institution of slavery demanded desperate reform".[১]

এই তত্ত্বকে শুধু চিন্তার আসমানে ঝুলিয়ে রাখা হয়নি, মাটির পৃথিবীতে তা প্রয়োগের কার্যকরী ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে আল-কোরআন। "নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা বা স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে ব্যক্তি আত্মার মুক্তির মধ্যে ইসলাম নিজেকে আবদ্ধ রাখে না। **ব্যক্তি আত্মা নিঃসন্দেহে প্রচুর মূল্যবান, কিন্তু সমাজেই এর জীবন বিচরণ ও অস্তিত্ব। সমাজই এর আত্ম সচেতনতা এনে দেয় ও তার উন্নতি সাধন করে**। সব নৈতিকতারই একটা সামাজিক সম্পর্ক আছে। ইসলাম মানুষকে সব সময়ে সমাজের মধ্যেই দেখে ও তার জন্য একমাত্র **সামাজিক ন্যায়বিচারই উচ্চতর স্তরে পৌঁছার ভিত্তি**। ইসলাম কোন ব্যক্তির জন্য তার প্রতিবেশির প্রতি শুধু প্রেম প্রচারে ক্ষান্ত হয়নি। সব মহান ধর্মই উচ্চ নৈতিকতা প্রচার করেছে, কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইসলামের মতো শুরু থেকেই কোন ধর্ম **জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র স্থাপনের** চেষ্টা করেনি। ইসলাম প্রকৃতই তার আদর্শ অনুযায়ী একটা রাষ্ট্র গঠন করেছিল ও তাকে আদর্শ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। প্লেটো দার্শনিককে রাজা হিসেবে দেখিয়েছিলেন। এতে কীভাবে ও কেন একটা রাষ্ট্র গঠন করা হবে তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যদি জনগণ সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন বাস্তব ফল লাভ করতে চায়, তাহলে ঐ ফল লাভের জন্য তাদেরকে অবশ্যই একত্রিত হতে হবে। বিচার-বিবেচনাশূন্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পশু-প্রবৃত্তি প্রণোদিত, ব্যক্তি ও শ্রেণি স্বার্থে বিক্ষত পৃথিবীতে এ রকম আদর্শভিত্তিক সংগঠনকে সব সময়েই তার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। **ইসলাম অর্থ শান্তি, শান্তি যুদ্ধের বিপরীত**।[২]

আল-কোরআন মানবজাতির সকল সদস্যের প্রতি নাযিল হয়েছে। এই মহান কিতাবের বয়ানের ক্রিয়াপদ 'সদাবর্তমান'। এতে সকল মানবজাতিকে নিজের

অস্তিত্ব, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে, একত্রিতভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করার নসিহত করা হয়েছে। মানবজাতির একটি সম্মিলিত পরিবার এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। লালন সাঁই-এর ভাষায় :

"এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যে দিন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান জাত গোত্র নাহি রবে।
শোনায়ে লোভের বুলি
নেবে না কাঁধের ঝুলি
ইতর আতরাফ বলি,
দূরে ঠেলে নাহি দেবে ॥
আমির-ফকির হয়ে এক ঠাঁই
সবার পাওনা পাবে সবাই
আশরাফ বলিয়া রেহাই
ভবে কেহ নাহি পাবে ॥
ধর্ম-কুল-গোত্র জাতির
তুলবে না গো কেহ জিগির,
কেঁদে বলে লালন ফকির
কে মেরে দেখায়ে দেবে ॥[৩]

অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) 'সুফি সভ্যতা' বলতে এমন এক ধরনের সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের প্রতি নির্দেশ করেছেন, যা সর্বজনীন ব্যবস্থা, সর্বহারাদের জন্য সুবিচার বাণী এবং প্রকৃত কল্যাণকামী মানব সভ্যতা।[৪]
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সংস্কৃতি।

টীকা:

১. Major Themes of the Quran. F. Rahman, University of Chicago, 1978.
২. Islamic Ideology; Dr. Khalifa Abdul Hakim, Lahore, 1968.
৩. লালন সঙ্গীত (অখণ্ড), দিলীপ বিশ্বাস, গান নং ১৫৪; ঢাকা, ২০১৬ খ্রি.
৪. অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.), বেলায়তে মোত্লাকা : 'সুফি সভ্যতা দিশারী' অধ্যায় এবং একই গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বিদ্যাবত্তা

১. যে-কোন মানুষ প্রতিভাত হন তাঁর বিদ্যাবত্তার দর্পণে। দার্শনিক, বিজ্ঞানীরা তো বটেই। ওলী-আল্লাহ্দের কথা অবশ্য ভিন্ন, তাঁদের অবস্থান ও অভিব্যক্তি উন্নততর। আমরা ইতোমধ্যেই অনুধাবন করেছি যে, অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) জাহেরী জগতে একজন দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী পদাতিক এবং একই সাথে রূহানী ঋণবনে একনিষ্ঠ নিভৃতচারী। জাহেরী জগতে তাঁর বিকাশ ও ব্যাপ্তি বিদ্যাবত্তা এবং তার প্রকাশ-মাধ্যম খাতা-কলমে। কোরআন নাযিল হবার একেবারে সূচনাতেই 'পঠন' ও 'কলমের' সাহায্যে শিক্ষাদানের মৌলিক বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে (৯৬: ১–৪)। এই সূত্রটা পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণের গোড়া থেকেই কার্যকর রয়েছে এবং বিজ্ঞান-সভ্যতা সংস্কৃতির বাহন হিসেবে রোজ কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।

২. অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে বহুফসলা। আল-কোরআন, হাদিস, ফিকাহ্, মানতিক, ইতিহাস, দর্শন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, তুলনামূলক অর্থাৎ Critical theory-র মানদণ্ডে রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক আদর্শ এবং কর্মসূচির তুলনা এবং একই সাথে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে উম্মি জনগণকে দিক-নির্দেশনা প্রদান প্রভৃতি মানবিক কল্যাণময় সৃজনশীলতায় সুশোভিত তাঁর বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞান-সাধনা। এ সম্পর্কে সম্যক বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ গ্রন্থ 'বেলায়তে মোত্লাকা' থেকে উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ:

“বর্তমানে দেখা যায়, বিশ্ব জাতিসংঘে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার বিষয়ই মূল্যবান আলোচ্য বিষয়। তথায় বিশ্বাসজনিত বস্তু বা ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ ঝগড়া বা আলোচ্য বিষয় নাই। যাহারা খোদা মানে এবং যাহারা মানে না, তাহাদের মতবাদের উপর কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থিত হয়না বা উহা লইয়া কোন বিরোধ করেনা। বরং যাহা লইয়া ঝগড়া-ফ্যাসাদ দেখা যায়, তাহা নেহায়ত বৈষয়িক এবং ধন সঞ্চয় ও বণ্টনের প্রাধান্যের বিরোধ। সুতরাং, দেখা যায়, বর্তমান জগতে ধর্মের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বা ঝগড়া-ফ্যাসাদ নাই এবং ইহার যৌক্তিকতাও নাই” (বেলায়তে মোত্‌লাকা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, আত্মদর্শন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০ খ্রি.)।

সেই ১৯৫০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমকালীন বিশ্বের নয়া পোলারাইজেশনের সময় একদিকে ইউরোপ-আমেরিকা এবং অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন প্রজাতন্ত্রের শীতল যুদ্ধ, কূটযুদ্ধ, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মূল কারণ অত্যন্ত সহজ-সরল বোধগম্যভাবে পত্রস্থ করার দক্ষতা অর্জন তাঁর নিবিড় অধ্যয়ন ও ব্যাপক বিদ্যাবত্তার অন্যতম প্রমাণ। একই অধ্যায়ে তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন-সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোর কল্যাণধারা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

“খোদার ফজিলত প্রত্যাশী মানব সন্তান, ধন-সম্পদের মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া নানা দেশ-বিদেশ হইতে দলে দলে ধাইয়া আসে। ১০ই মাঘ এই প্রেম-প্রেরণা জাগ্রতকারী কলা-কৌশলীর দ্বার প্রান্তে, বহন করিয়া আনে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আজিজির অর্ঘ। উপহার দেয় সালাম, শান্তি। নিয়া যায় খোদায়ী জজবা, প্রেম-প্রেরণা এবং **“মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠ অবদান অহমজ্ঞান বর্জিত সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা”**।

‘ধর্ম’কে তিনি দেখেছেন ‘মানুষকে ভালোবাসতে’ শেখানোর অবলম্বন রূপে। ‘ধর্মে’ ব্যক্তিগত লাভালাভের হিসাবের, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রবেশাধিকার নেই। ত্যাগী মহান গুণীরা বলেন, ‘ধর্ম মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়।’ সুবৃহৎ দার্শনিক ও ধর্মের শীতল ছায়াতলের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি একই অধ্যায়ে সহজভাবে বলেন; “প্রত্যেক ধর্ম বা সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মাচরণে নিষ্ঠাবান থাকা দরকার। ধর্মহীন লোকেরা বহু কিছু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেও এ যাবৎ বিশ্ব-সমস্যার

কোন সমাধান দিতে পারে নাই। বরং দিন দিন নতুন সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে।”

এখানে সঙ্গতভাবেই একটা প্রশ্ন জাগে, তাহলে অপটিমাম বা সর্বাধিক অনুকূল সমাধান কোন পথে? এ প্রশ্নটা এখন বিশ্বের তাবৎ কল্যাণকামী আত্মাগুলোকে বিদ্ধ করছে। অছিয়ে গাউসুল আযমের এই দৃষ্টিভঙ্গি একাধারে তাঁর বাস্তব সমাজ-সচেতনতা এবং জীবন ঘনিষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠতার পরিচায়কও বটে।

৩. অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বিদ্যাবত্তার ব্যাপকতা ও গভীরতা খুবই ব্যাপক। তা অনুধাবন করা যায়, তাঁর শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি এবং ব্যক্তিগত অধ্যয়ন-সাধনার বিরতিহীন অভিযাত্রা দেখে। তাঁর প্রথম শিক্ষক তাঁর দাদাজান হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)। এরপর দাদাজানের তত্ত্বাবধানে গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন যথাক্রমে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাবুনগর নিবাসী মওলানা অলিউল্লাহ্ এবং হাটহাজারী থানার মির্জাপুর নিবাসী খাদেম বিদ্বান মওলানা হাফেজ ক্বারী তফাজ্জল হোসাইন। শেষোক্ত জনের হাতে তিনি আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি অবসর নিয়ে ঘরে যাবার প্রাক্কালে তাঁর সংগৃহীত বহু ধর্মীয় ও ইসলামী দর্শন সমৃদ্ধ পুস্তক তাঁর হাওলা করে আসেন (এ বিষয়ে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী অংশে আরো আলোকপাত করা হয়েছে)।

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে উদ্ধৃত বিভিন্ন তথ্যের উৎস হিসেবে ৩১ (একত্রিশ)টি পুস্তকের একটা তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের ব্যবহৃত তথ্যাদির নির্ভুল যথার্থ উৎস নির্দেশ করা ঐ সময়ে তাঁর জন্য জরুরি ছিল সমকালীন অবাঞ্ছিত বিতর্কের তীর থেকে তাঁর নিজেকে ও গ্রন্থকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখার জন্য। বিশ্বের সর্বত্র সর্বজন স্বীকৃত দ্বিধাহীনভাবে নির্ভরযোগ্য চারটি আন্তর্জাতিক ভাষায় রচিত ৩১টি মহৎ পুস্তকের তালিকা নিম্নে মুদ্রিত হলো:

“বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে যে সকল কেতাব হইতে দলিল প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে উহাদের পরিচয়–

ক্রমিক নং	কেতাবের নাম	লেখক	ভাষা	প্রেস
০১	মতালেবে রশীদী	মওলানা তোরাব আলী কলন্দর	ফার্সী	নওল কিশোর
০২	নশরুত্তিব ফি জিকরিল হাবীব	আশরফ আলী থানবি		কানপুর
০৩	দিওয়ানে নূর	মছনবি হইতে সংকলন	বাংলা	
০৪	মছনবি	মওলানা রূমী	ফার্সী	
০৫	কোরআন পাক			
০৬	তাছাওয়োফে ইসলাম	লিখক ঃ– ডঃ মোহাম্মদ মোস্তফা হেলমী প্রফেসর ফোয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়, মিসর। অনুবাদক ঃ– রঈছ আহ্‌মদ জাফরী।	উর্দ্দু	গোলাম আলী এণ্ড সন্স লাহোর
০৭	দীওয়ানে আলী	হজরত আলী (কঃ)	আরবী	
০৮	হাদীছে নববী		আরবী	
০৯	কছিদায়ে গাউছে ছক্‌লাইন	হজরত পীরানে পীর দস্তগীর	আরবী	
১০	ফছুছুল হেকম	হজরত ইবনে আরবী	উর্দ্দু তরজুমা	মস্তফায়ী প্রেস লক্ষ্ণৌ
১১	তফছীরে মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী–		আরবী	মিসর
১২	জেয়াউল কুলুব	হজরত হাজী এমদাদুল্লাহ মহাজেরে মক্কী	ফার্সী	মজিদী কানপুর
১৩	তফছীরে হক্কানী	মওলানা আবদুল হক হক্কানী	উর্দ্দু	
১৪	তজকেরায়ে শায়খে আকবর	মোহাং বরকতুল্লাহ ফেরেঙ্গী মহল্লী	উর্দ্দু	মস্তফায়ী প্রেস লক্ষ্ণৌ
১৫	আয়না-ই-বারী	মওলানা আবদুল গণী কাঞ্চনপুরী	উর্দ্দু	চট্টগ্রাম ইসলামিয়া লিথো প্রেস
১৬	চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল	মাহ্‌বুব-উল-আলম	বাংলা	ইসলামিয়া লিথো প্রেস, চট্টগ্রাম–
১৭	নূতন ইতিহাস	আবদুচ্ছত্তার এম, এ	বাংলা	নবাব পুর রোড ঢাকা
১৮	ফতহুর রব্বানী	অনুবাদ– মওলানা ছানাউল্লাহ	উর্দ্দু	আলমী প্রিন্টিং
১৯	মজাকুল আরেফিন তরজুমা এহয়াউল উলুম	মওলানা মোহাম্মদ আহছান ছিদ্দীকী	উর্দ্দু	কিশোর প্রেস লক্ষ্ণৌ
২০	শেফাউল আলীল তরজুমায়ে কওলুল জমীল	মওলানা আবদুল আজিজ দেহলভী	আরবী ও উর্দ্দু	কৈয়ুমী প্রেস কানপুর
২১	তফছীরে আজিজী	ঐ	উর্দ্দু তরজুমা	লক্ষ্ণৌ
২২	মোনাজেরাতুচ্ছদরাইন			
২৩	মকালাতে কোরআনী	মওলানা আবদুল্লাহিল এমাদী	উর্দ্দু	টাইম প্রেস লাহোর
২৪	গোলেস্তান	শেখ ছায়াদী	ফার্সী	
২৫	মছনবি গঞ্জে রাজ	আল্লামা আবদুর রহমান ফতেহ আবাদী	ফার্সী	লাহোর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ
২৬	তনবিরুল কুলুব			
২৭	এহয়াউল উলুম	ইমাম গাজ্জালী	আরবী	
২৮	দিওয়ানে হাফেজ শিরাজী	হাফেজ শিরাজী	ফার্সী	লাহোর
২৯	জোবদাতুছ ছালেকীন	তর্জুমা গণিয়াতুত্তালেবীন	উর্দ্দু	
৩০	মজমুয়া ফতোয়া	মৌলানা আবদুল হাই		
৩১	তফছীরে হোসাইনী	কাশেফী	ফার্সী	

বলা বাহুল্য, নাতিবৃহৎ বহুমাত্রিক দার্শনিক গ্রন্থ 'বেলায়তে মোত্‌লাকা'-ই তাঁর নিরবচ্ছিন্ন আয়াসসাধ্য অধ্যয়ন, গবেষণা ও রচনার মহাকালের অন্যতম সাক্ষী। আরো উল্লেখ্য, 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে ব্যবহৃত আল-কোরআনের আয়াতসমূহের বাংলা অনুবাদও তাঁর নিজের এবং অত্যন্ত নিপুণ। এটা তাঁর ব্যবহারিক পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতার অন্যতম দৃষ্টান্তও বটে।

৪. অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র অমর রচনাবলি :

অছি-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তাঁর জীবদ্দশায় ছোট বড় বারটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং দশটি (১০) গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী নামীয় সংগঠনের বিধি-বিধান গঠনতন্ত্র নিজে রচনাপূর্বক প্রকাশের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। মূলতত্ত্ব (২য় খণ্ড) ওজিফা এবং তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি পরবর্তীতে পাওয়া গেছে।

১. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত

২. বেলায়তে মোত্‌লাকা

৩. এলাকার রেঁনেসা যুগের একটি দিক

৪. প্রতিবাদ লিপি

৫. বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ

৬. মানব সভ্যতা

৭. মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া

৮. মুসলিম আচার ধর্ম

৯. মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার [১ম খণ্ড]

১০. মূলতত্ত্ব [২য় খণ্ড] (অপ্রকাশিত)

১১. আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর গঠনতন্ত্র

১২. জীবনদর্শন (আত্মজৈবনিক) পাণ্ডুলিপি (অপ্রকাশিত)

মুসলিম আচার ধর্ম, মূল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা মুসলিম পরিবারে নামায-কালাম-রোজা প্রভৃতি নিয়মিত ধর্ম-কর্ম সম্পন্ন করার সংক্ষিপ্ত পথ নির্দেশক হিসেবে অত্যন্ত উপযোগী।

৫. পবিত্র আল-কোরআনবেত্তা অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) :

আল-কোরআনের কেবল আয়াতসমূহ নয়, প্রত্যেক শব্দের ব্যঞ্জনা তাৎপর্য, বহুমুখী প্রয়োগ ও অর্থের যথার্থ ব্যাকরণসম্মত সমীক্ষণ তাঁর জ্ঞানের গভীরে সদা সক্রিয় ছিল। বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে এর সত্যতা প্রকট রয়েছে। আল-কোরআন আত্মস্থ করার অপটিমাম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চোখ ও মেধার ক্যামেরায় তা সহজে ধরা পড়বে। এ বিষয়ে লিখতে গেলে পৃথক একটি পুস্তক দাঁড়িয়ে যাবে। আল-কোরআনবেত্তা বিশেষণটি তাঁর ক্ষেত্রে সঙ্গতভাবেই প্রযোজ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর দৃষ্টিতে রুহানিয়াত, রব্বানিয়াত, রবুবিয়াত ॥ নাস্তিক্যবাদের বিপরীতে ‘বেলায়তে মোত্‌লাকা’

১. মানব-মস্তিষ্কজাত কৃত্রিমতা বনাম আল্লাহ্‌র দানের সর্বজনীনতাঃ

ঈমানে মুয্‌মাল-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দার্শনিক-সাধক কবি মওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (র.) বলেন, “পাকা ঘরের খটরকে তোপ দেগে বিলীন করে দাও, দেখবে পূর্বে খটরে পতিত আলো খটরগুলোর অনুপাতে বিভিন্নরূপে দেখা গেলেও খটর ভেঙ্গে দেবার ফলে সূর্যের আলো সমানভাবে পড়ছে। সূর্যের আলোতে কোন প্রকার তারতম্য সৃষ্ট হচ্ছে না”। এই বিশ্লেষণ সকল প্রকার মানবিক, পার্থিব, কৃত্রিম ভেদাভেদনীতি বিরোধী এবং সর্বজনীন সমতাবাদ, সমভাবে প্রকৃতির উপাদান-অবদান পাবার আল্লাহ্‌ প্রদত্ত অধিকারে অধিকারী।

এর জের ধরে অছিয়ে গাউসুল আযম বলেন, তদ্রূপ নবিদের ধর্মীয় বিধানগত পার্থক্য যুগোপযোগী এবং তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভিন্ন ভিন্নভাবে দৃশ্যমান হলেও মূলতঃ নৈতিক ধর্মে ও উদ্দেশ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য কেবল কর্ম-পদ্ধতির।১ এখানে আল-কোরআনের একটা আয়াত সবিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ “আপনি বলে দিন, প্রত্যেকে নিজ নিজ পন্থা অনুযায়ী আমল করছে আর তোমাদের রবই ভালো জানেন, কে হেদায়তের পথে চলছে” – (১৭ : ৮৪)।

২. ‘আচার ধর্মের’ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নৈতিক ক্ষেত্রে’ সমন্বয়ঃ

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনু আরবীর (র.) ‘ফুসুসুল হিকম’ গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে বলেন যে, গাউসুল আযম হযরত মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) প্রবর্তিত ত্বরিকত ব্যবস্থাধীন ছয় শতাধিক বছরে বিশ্বময় জাহেরী জাগতিক প্রশাসন ও সরকারে বলতে গেলে আমূল পরিবর্তন আসে। তাঁর ভাষায়; “সময়ের ব্যবধানে ও ইসলামী হুকুমতের অবসানের ফলে ইসলামী ধর্ম জগতে নানা এখতেলাফ বা মতানৈক্য দেখা যায়। তবে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার বাতেনী শাসন-পদ্ধতির প্রথানুযায়ী সমুচিত হেদায়ত ও উপযুক্ত শক্তিশালী ত্বরিকতের প্রভাবে জগদ্বাসীকে অন্ধকার হইতে সহজতমভাবে উদ্ধার মানসে বেলায়তে মোকায়াদায়ে মোহাম্মদীকে “বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী” রূপে পরিবর্ণিত করেন, যাহা বেলায়তের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বাধাহীন বিকাশ ও সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত শক্তি। ইহা বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে নীতিগতভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে। কারণ, ইহা মনে করে যে, বিভিন্ন মতবাদের “মত ও পথ” বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকের গন্তব্যস্থল এক। এই বেলায়ত শক্তি ধর্ম-জগতের ও সমাজ জীবনের আবর্তন-বিবর্তনমূলক শ্রেষ্ঠতম স্বাভাবিক ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট যুগ। **যাহাকে বিশ্ব বেলায়ত বা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠাতা শক্তি সনাতন ইসলাম বলা যায়।**

এই বেলায়ত জয্‌ব ও সলুকের সংমিশ্রণে ইহার অধিকারীকে নবি করিমের (দ.) পূর্ণ নবুয়ত ও বেলায়তের যুগলরূপ বিকাশ করিতে সক্ষম হয় এবং হাদিয়ে মাহদীরূপে হযরত ঈসা (আ.)-এর বেলায়তী স্বরূপকে একত্রে সমাবেশ করিতে সক্ষম”।

হযরত ইবনু আরবীর (র.) ফচ্ছে ইদ্রিসী (আ.) এবং ফচ্ছে ওজাইরী (আ.) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, “ওলীয়ে কামেলের কাজ খোদার ইচ্ছা শক্তি ও হেকমত অনুযায়ী হয়; তুমি যখন নবিকে মকামে শরআর বাহিরের কথা বলিতে শুন, তখন মনে কর, ইহা তাঁহার খোদা পরিচিতি অলি হওয়ার ফলে বলিতেছেন এবং এই কারণে তাঁহার আলেমে আরেফ ও অলি-আল্লাহ্ হওয়ার মর্তবা ছাহেবে শরিয়ত ও নবি হওয়ার মর্তবা হইতে অগ্রবর্তী। কারণ, আলেম তিন প্রকার: (১)

আলেম বিল্লাহ্ লা-বে আমরিল্লাহ, (২) আলেম বে আমরিল্লাহ্ লা-বিল্লাহ্, (৩) আলেম বিল্লাহ্ অ'-বে আমরিল্লাহ্। ১ম ব্যক্তি খোদার জ্ঞান রাখেন বটে, খোদার হুকুমের খবর রাখেন না। তাই যাহারা মজজুবে মাহাজ, তাহারা শরআর তকলীফ মুক্ত, যেহেতু ভাববিভোরতার ফলে তাহার বাহ্যিক জ্ঞান বিলুপ্ত। দ্বিতীয়টি শারাহ, শরীয়ত বিধিব্যবস্থা বিদ্যা অবগত, খোদার পরিচয়হীন, শুধু সংসার ধর্মী। তাই মওলানা রুমী বলেন, "তুমি খোদার সঙ্গে মিথ্যা দুনিয়ার মোহে, লোভকে কামনা কর, তাহা পাগলামী ও অসম্ভব।" তৃতীয় স্তরের আলেম শ্রেষ্ঠ, নায়েবে নবি। ইনি খোদা জ্ঞানবান এবং আহকামেরও খবর রাখেন, যথা; হযরত খিজির (আ.)। "উক্ত বেলায়তে মোত্লাকার অধিকারী এই তৃতীয় স্তরের অলি উল্লাহ্, বিশ্ববাসী সকল ধর্মাবলম্বীকে কাহারও আচার ধর্মে বাধা না দিয়াও নৈতিক ক্ষেত্রে একত্রিত করিতে সমর্থ। কারণ, বেলায়তে মোত্লাকা কোন প্রকার ধর্মীয় বিরোধকে সমর্থন করে না। বরং, ইহা রোষ বিবর্জিত এবং গন্তব্য পথের মূল উদ্দেশ্য অনুসারেই বিচার করিয়া থাকে।"

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, এই বিশ্লেষণ মহান মদিনা সনদ বা সংবিধানের মর্মবাণীর অনুসিদ্ধান্তমূলক, যেখানে সকল নাগরিকের জীবনাচার পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখে বহুত্ববাদী সমাজ বিনির্মাণের অবকাশ নিশ্চিত রাখা হয়েছে।

"বেলায়তে মোত্লাকা" শরীয়তের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলেও হাকীকত বা ইহার উদ্দেশ্যস্থলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। যেমন ঃ– কোন পাহাড়ী ব্যক্তি যাহার নিকট নবির দাওয়াত বা আহ্বান পৌঁছার সুযোগ হয় নাই, তাহার জন্য শুধু এক স্রষ্টা আছে; এইটুকু বিশ্বাসই নাজাতের জন্য যথেষ্ট। কোন নবির উপর ঈমান আনা এবং ধর্মের অন্যান্য নির্দেশাদির জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে না; এই কথা সর্ববাদীসম্মত।

"এই যুগে স্তুপাকার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক ভাবধারা যুক্তির বেড়াজাল; নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের মনোরম সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে কেহ যদি সঠিক ধর্মের ডাক হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাছিয়া লইতে সক্ষম না হয়, তাহাকে কি উক্ত পাহাড়ীয়া ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত করিয়া শুধু তওহীদ বা একেশ্বরবাদের স্বীকৃতির জন্য দায়ী করা সমীচীন নহে?

"উপরন্তু পৃথিবী পরিব্যাপ্ত শির্‌ক ও নাস্তিকতাবাদের আওতা হইতে মানব জাতিকে সোজাসুজি "আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের" মুসলমান করিয়া লওয়ার ভাবধারাকে ইতিহাস বাস্তবক্ষেত্রে অবান্তর প্রমাণিত করিয়াছে। ইহার পরও পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের ব্যাপক ডাক, কিভাবে পৌঁছাইতে পারা যায়?

"আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিতেছেন :

"ভাল উপদেশ ও কৌশল বা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে (মানব জাতিকে) তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর" (ছুরা নাহল ১২৫ আয়াত)।

"এই আয়াতের মর্মমতে মানব জাতিকে যদি পাকা মুসলমান করিয়া লইবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী হইতেছেনা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহাদের অন্ততঃ তওহীদের আওতাভুক্ত করার প্রয়াস ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

"ভারতবর্ষে খাজা আজমিরী (কঃ) ও তাঁহার পরবর্তী বুজর্গানের আবির্ভাব ইসলাম প্রচার ও রূহানী প্রভাব বিস্তার করার ফলে পাক ভারতে আজ পনর কোটির অধিক মুসলমান দেখা যায়। এবং রামানন্দ, রামানুজ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রী লোকনাথ, নানক, কবীর, রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মবাদী চৈতন্য প্রভৃতি হিন্দু পৌত্তলিকতা হইতে দূরে সরিয়া ইসলাম গ্রহণ না করিলেও তওহীদের স্বীকৃতি দান করিতেছেন।

"একেশ্বরবাদ কি পৌত্তলিকতা হইতে ইস্‌লামের দিকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী নহে? ইহা কি ইসলামী রূহানীয়তের অবদান নহে? তওহীদের স্বীকৃতি দিয়াছে বলিয়া যদি আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে নাজাত দেন, তাহাতে কাহারো আপত্তি করিবার কারণ আছে? পৌত্তলিকতা ও শির্‌কের মধ্যে অন্ততঃ স্রষ্টার স্বীকৃতি আছে; কিন্তু নাস্তিকতাবাদে সেই স্বীকৃতি পর্য্যন্তও নাই। অথচ বর্তমান যুগে নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোঁড়াবাদ সমগ্র জগতকে গ্রাস করিয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে এবং বিরোধই বাড়াইতেছে।

"পক্ষান্তরে সূরায়ে শুরার ১৫ আয়াতে কোরানে হাকিমের ভাষায় মোহাম্মদ (দ.) বর্ণনা করেন ঃ–

"আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ কারবারে "আদল" বা বিচার-সাম্য রক্ষা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। যেহেতু আল্লাহ্‌তা'য়ালা আমাদের যেইরূপ পালনকর্তা, তদ্রূপ

তিনি তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের কাজকর্ম, ধর্মাচরণ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজকর্ম ও ধর্মাচরণ তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন "হুজ্জত" বা বিরোধ নাই। আল্লাহ্-পাক একদা আমাদিগকে তৌহীদ বা অদ্বৈত সমাবেশ স্তরে একত্রিত করিবেন। যেহেতু সকলই সেই সৃষ্টির মূলাধার জাতে-পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল।" এই তৌহীদ "জময়ানী", বিশ্ববাসীকে একই নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে সমর্থ ও আদলে মোত্লাকের (নির্বিকার সাম্যের) যোগ্যতাসম্পন্ন। পৃথিবীকে এই পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোঁড়াবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক বিরাট কার্যকরী রূহানী শক্তি ও তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এক মহাকৌশল বা হেকমতের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেই বিরাট শক্তির সূচনা হজরতে আকদছের জাতে বা বরকতে হইয়াছে। এবং সেই মহাকৌশল বা হেকমতের নাম "বেলায়তে মোত্লাকা।"[১]

মোদ্দা কথায়, বেলায়তে মোত্লাকা মদিনা সনদ থেকে উৎসারিত বহুত্ববাদী শান্তিপূর্ণ মানব সমাজের রুহানী বা আধ্যাত্মিক জ্যামিতি। অছিয়ে গাউসুল আযমের 'বেলায়তে মোত্লাকা' শীর্ষক গ্রন্থটি **ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থ-সম্পদ বিষয়ক তত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্বের মুক্তার মালা**।

৩. তৌহিদে জময়ানী বা অভিন্ন নৈতিকতার ভিত্তিতে বিশ্ব মানবতার সমাবেশ ও বিচারসাম্য প্রসঙ্গ :

অভিন্ন নৈতিকতার মঞ্চে বিশ্ব মানবতার সমাবেশ ও বিচারসাম্য সম্পর্কে এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩নং অনুচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে। আল-কোরআনের সূরা শুরার ১৫নং আয়াতে যে সমস্যা ও ভারসাম্যমূলক সমাধানের মহৎ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে, তা আল-কোরআন নাযিলের পূর্ববর্তী সর্বপ্রকার মানবসমাজেরই সমস্যা এবং এ সমস্যার টেকসই সমাধান এখনো সম্ভব হয়নি। নবিজী হযরত মুহাম্মদ (দ.) মদিনা সনদের ভিত্তিতে তা সমাধানের সূত্রপাত করেছিলেন, ইতিহাসে তাঁর এই প্রয়াস এখনো প্রশংসিত হচ্ছে। জাতিসংঘ প্রভৃতি বিশ্ব মানবিক সংস্থা এই সমস্যার বৃত্তে ভারসাম্যমূলক সমাধানের সন্ধানে ঘুরপাক খাচ্ছে। ইসলাম এবং এর পরবর্তীকালে এর আলোকে বিকশিত মানব সংস্কৃতির শিক্ষা এই যে, **মানব জীবন অভিশাপ নয়**। ইসলাম জীবনকে 'আদি পিতার পাপের ফল' বলে মনে করে না। বরং তা আল্লাহ্র দান। জীবনের সব

কর্ম ও চিন্তা আল্লাহ্‌র আনুগত্য বলে গণ্য হতে পারে, যদি সেগুলো তার প্রকৃতি-নির্ধারিত 'স্ব'-ভাবের অনুকূল করে তোলা যায়। **তাই ইসলামী জীবন-কাঠামোয় শুধু ধর্মাচারই (Rituals) নয়, উপরন্তু পৃথিবীতে বাঁচার সংগ্রাম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ন্যায়বাদী রণকৌশল, যুক্তিমন্ত উত্তরাধিকার, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সুবিচারমূলক আইন ভিত্তিক সার্বিক ফায়সালা প্রভৃতি যাবতীয় কর্মপ্রয়াসই অন্তর্ভুক্ত**।

এই মন-মানসিকতা অর্জনের জন্য একটা পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও স্তর তৈরি করতে হয়। জ্ঞান, বুদ্ধি, ষড়রিপু, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, দৈহিক শক্তি প্রভৃতির স্বৈর-স্বেচ্ছাচারী অপব্যবহার করা যাবে না। তাই চূড়ান্ত জবাবদিহিতা আল্লাহ্‌র কাছেই পেশ করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষকে পেটের ক্ষুধাসহ বিবিধ ক্ষুধার পিণ্ড বা প্রতীক হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এসব ক্ষুধা নিয়েই পৃথিবীতে তার আমৃত্যু অবস্থান।

গ্রহরূপে সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে মানুষকে শত প্রকার প্রতিবন্ধকতার সাথে সংগ্রাম বা জেহাদ করে নিজেকে পবিত্র রাখতে হয় এবং যথার্থ পথে চলতে হয়। এই যথার্থ সহজ পথ সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারণা প্রয়োজন। তবেই পৃথিবীতে তার মানব জনম ও জীবন সার্থকতার ফুলে-ফলে ভরে উঠে। এ প্রসঙ্গে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে মুত্তাকির সংজ্ঞায় আল-কোরআনে বলা হয়েছে: "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতেই তোমাদের সফল পুণ্য নয়, বরং পুণ্য আছে আল্লাহ্‌, আখেরাত দিবস, ফেরেশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবিগণের প্রতি ঈমান আনয়নে; আর আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় আত্মীয়-স্বজন, এতিমগণ, মিসকিনগণ, মুসাফিরগণ, সর্বহারাগণ এবং 'দাস' মুক্তির জন্য অর্থ প্রদানে, আর সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান, প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি প্রদানে, অর্থ সঙ্কট, দুঃখক্লেশ, সংগ্রাম, প্রতিকূলতায় ধৈর্য ধারণে; বস্তুত তারাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী (২ : ১৭৭)। সূরা বালাদ-এর ১৩-১৫ আয়াতে সরাসরি এবং সূরা দোহাসহ বিভিন্ন সূরায় **দাস মুক্তির** কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। ভূমিদাস, ক্রীতদাস প্রথা দৃশ্যতঃ বিলুপ্ত বটে, তবে এখানকার অর্থনীতির মতে মজুরী শ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে শ্রমদাস প্রথা বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান। মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে দেবার নীতিতে আস্থাশীল **পালনবাদী অর্থনীতির সমাজই** মজুরী দাস প্রথার ধার ভোতা করতে পারে।

এই পথে চলার প্রশিক্ষণ ও শক্তি অর্জন তথা হেদায়েত পাবার যোগ্যতা বা অবস্থা এবং সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক উৎকর্ষতা হাসিল সম্পর্কে অছিয়ে গাউসুল আযম-এর কিছু উপপাদ্য সংযোজিত হলো :

৪. হেদায়ত পাওয়ার যোগ্যতা বা অবস্থা ও সফলতা অর্জনের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য কি?

বেলায়তে মোত্‌লাকার দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, "হেদায়ত পাওয়ার যোগ্যতা এবং সফলতা অর্জনের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমটি নবুয়তের শানের সহিত সংশ্লিষ্ট। যাহা আহ্‌কামী আদেশ নিষেধমূলক ও তবলীগী বা প্রচারমূলক। ফোরকানী অর্থাৎ বিভিন্ন রূপ প্রদানকারী প্রগতিমুখী বস্তু। ইহা বিভিন্ন জিনছিয়তের বা ব্যক্তিত্বের বিকাশোন্মুখ প্রতিভা। ইহাতে সর্বব্যাপ্ত, সচেতন ও সজ্ঞান বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আদেশ-নিষেধ বাণী মূলে বিকাশিত ও বিরাজিত। কোরআন-পাকের বাণীঃ– "কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফি শান" (ছুরা আর রহমান- ২৯) অর্থাৎ "আল্লাহ্ প্রত্যহ বিভিন্ন অবস্থাতে বিরাজমান"।

যেইরূপ ফুলের কলির মূলাধারে ভ্রমরের গুণগুণী ও বুলবুলির কিচিরমিচির ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত ফুলের বিকাশ দেয়; সেইরূপ সৃষ্টির মূলাধার স্রষ্টা, "কুন্" এর কুন্‌কুনিতে ও বোলের বোল-বোলিতে সৃষ্টির বিকাশ দেয়।

"হামা আজ উস্ত" অর্থাৎ সমস্তই তিনি হইতে বা স্রষ্টা হইতে সৃষ্ট। ইহা শাহুদীয়া ছুফী মতবাদ বা দর্শন। ইহা নবুয়তের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে; অর্থাৎ বাহ্যিক দিক প্রধান।

দ্বিতীয়টি নবির বেলায়তী শানের বা অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহা তর্‌গীবী বা উৎসাহমূলক প্রকৃতি বিশিষ্ট আছরারী বা রহস্যমূলক অবস্থা। ইহা জময়ানী বা সমাবেশকারী ভাবধারা সংযুক্ত ছুফী মতবাদের বিশিষ্ট ধ্যান ধারণা।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা মওজুদা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য বস্তুর হাস্তি বা অন্য বস্তুর অস্তিত্ব মিথ্যা। ইহাকে ছুফী পরিভাষায় 'হামা উস্ত' বলা হয়। অর্থাৎ সবকিছুই তিনি (স্রষ্টা)।

"ইহা অজুদীয়া ছুফী মতবাদ বা দর্শন। বৈদিক দর্শনের সহিতও ইহার মিল আছে। যেমন ঃ– "এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি।" ইহা বেলায়ত ঘনিষ্ঠ প্রধান ভাবধারা।

"মওলানা রূমী (র.) বলেন ঃ "মানব মন, যখন পীরের জ্ঞান জ্যোতির প্রতি নিবদ্ধ করা হয়, তখন ইহার অংশ স্বরূপ তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। (মছনবি)

"ইহা নেহায়েত মানব মনন প্রকৃতি সম্পন্ন, যাহা "তছদীক বিল যনান" দিলে বিশ্বাস ভাবধারায় ও মনন প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধতাতে বিকশিত হইয়া থাকে। আনুষ্ঠানিক কার্য্য কারণ ইহার অন্তরায় হইতে পারেনা বা এই মনোবৃত্তির পরিচায়কও হইতে পারেনা।

"ইহা চারিত্রিক অবনতি রোধ করার জন্য নহে। বরং চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্য নিতান্ত দরকার। চারিত্রিক অবনতি রোধ করার জন্য যাহা, তাহা এবাদাতে মোতনাফিয়া বা পাপকার্য্য বিরতকারী এবাদাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন কোরআনপাকে বলেন:– "ছালাত বা নামায মানবকে পাপ কার্য্য হইতে বিরত করে। এবং লজ্জাজনক কাজ হইতে রক্ষা করে। আমার স্মরণের জন্য নামায বা ছালাত কায়েম কর। খোদার স্মরণ নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড়"। ('বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

অতএব, পৃথিবী-সমগ্র সৃষ্ট জগতের নির্মাণ তথা বিজ্ঞান, পরিচালনা কৌশল এবং তাতে নিজের অবস্থান তথা মহান স্রষ্টা স্মরণ বা জিকিরে নিবিষ্ট থাকার অভ্যাস আয়ত্ব করা আবশ্যক"।

টীকা:

১. বেলায়তে মোত্লাকা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
২. সেকুলারিজম, দর্শন কোষ : সরদার ফজলুল করিম, ১৯৭৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

পঞ্চম অধ্যায়

উসুলে সাবআ : তাকওয়ার মন্‌জিলে পৌঁছার সহজ সোপান

১. উত্তম শুদ্ধিপন্থা:

আল-কোরআনের শিক্ষামূলক বয়ানের শুরুতেই বলা হয়েছে যে, "এই কিতাব মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশক"। এই বাণীর সাদামাটা অর্থ এই যে, আল-কোরআন অনুধাবন ও যথার্থ অনুসরণের যোগ্যতা অর্জনের প্রথম শর্ত হলো মুত্তাকী হওয়া। বিশ্লেষণকে আরো এগিয়ে নিয়ে বলা যায়, প্রকৃত মুসলিম হবার জন্য এটাই সহজ ও উত্তম শুদ্ধি পন্থা। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ভাষায়, হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) "ফানায়ে ছালাছা ও মউতে আরবা এই সাত প্রকার শুদ্ধি প্রণালী বা কর্মপন্থা কার্যকরী প্রত্যক্ষ কোরআনী হেদায়াত বলিয়া তিনি সাব্যস্ত করেন, যাহা সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য নির্বিরোধ ও সহজসাধ্য আইনুল একীন ও হাক্কুল একীন জনিত বস্তু।" এ প্রসঙ্গে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর বিবরণ: জীবন নামে খ্যাত পুকুরের বিশুদ্ধ পানি পান করিয়া মানবকুল যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করে, তদ্রুপ হজরতের বেলায়ত সুধা পানকারীও ছুফী মতানুযায়ী ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর অতিক্রম করিয়া পবিত্র হাদীছ মতে "মাউতু কব্‌লা আন তামাউতু" রূপ চারি প্রকার ইচ্ছা মৃত্যুকে বরণ করতঃ খোদা পরিচিতি জগতে ছুফী পরিভাষা মতে "হায়াতে আবদী" নামক নিত্য জীবন লাভ করে। ইহার সাহায্যে মানব, খোদা পরিচিতি জগতে উন্নীত হইয়া ঊর্ধতম সত্যবস্তু স্রষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া নিজ

স্রষ্টা সম্বন্ধে এক "কশ্‌ফী" নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে; যাহা সন্দেহের অতীত। উপরোক্ত তত্ত্ব, হজরত কেবলা কর্তৃক কবরে কোরআন পাকের সতর পাতা রাখার ইঙ্গিত বহন করে। "ফানায়ে ছালাছা ও মউতে আরবা" এই সাত প্রকার শুদ্ধি প্রণালী বা কর্মপন্থা কার্য্যকরী প্রত্যক্ষ কোরআনী হেদায়ত বলিয়া তিনি সাব্যস্ত করেন; যাহা সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য নির্বিরোধ ও সহজসাধ্য আইনুল একীন ও হাক্কুল একীনজনিত বস্তু।

ন্যায়নীতি বিবর্জিত হৃদয়হীন জন, অপরের প্রতি হিংস্র ব্যাঘ্র সুলভ রক্ত লোলুপতা পরিহার পূর্বক মানবিয় আকৃতি বিশিষ্ট বানরতুল্য প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। যাহার ফলে খোদার ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ ইচ্ছাকে বিলীন করার ফলে খোদা নির্ভরতা অর্জিত প্রাণ খাদ্য লাভে সমর্থ হয়। যাহা ছুফী দর্শন মতে "তছলীম এবং রজা" গুণজঃ প্রকৃতির ফল। মওলানা রূমী (রহঃ) বলেন, তুমি ফেরেশ্‌তা এবং পশু এই উভয় স্বভাবে স্বভাবিত। তিনি বলেন, "পশুর স্বভাব হইতে মুক্ত হও, ফেরেশ্‌তারও ঊর্ধ্বে যাইতে সক্ষম হইবে"।

ইহাতে বুঝিতে হইবে; নবি রসুল, ওলিয়ে কামেলগণ মানব জাতিকে স্রষ্টা অনুরাগ দান উদ্দেশ্যে পার্থিব অনুরাগ শিথিল ক্রমে চরিত্রবান কর্মঠ মানব সৃষ্টি করেন। তাই কোরান মজিদের প্রথম ভাগে "গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম অলদ্দোয়াল্লীন" (ছুরা ফাতিহা–৭) বাণী প্রকাশ আছে। এই আয়াত শরিফের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া আল্লামা ইবনে আরবী (রহ.) স্বীয় তফছীরে লিখিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্ তায়ালার "রহমান রহীম" গুণজ নামের ভরসায় বেপরোয়া পাপে লিপ্ত হয়; তাহারা 'মাগদুবিন'–গজবের যোগ্য এবং যাহারা খোদা তায়ালার প্রদত্ত ভালাই গ্রহন করেনা, অলস, খোদা প্রদত্ত প্রাকৃতিক ভালাইকে নিজ হিতার্থে কাজে লাগায়না এবং কর্মবিমুখ ও অস্বীকারকারী তাহারা "দোয়াল্লিন"–পথভ্রষ্ট। যাহারা এই উভয় পন্থার প্রতি নজর দিয়া আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র পেয়ারা নবি-ওলির অনুগত হইয়া ভালাইর পথে চলে তাহারাই 'মোসলেম' বা শান্তিপ্রিয় জাতি, খোদার অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য বিশ্ব মানবতার প্রতীক।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত ধর্ম ব্যবসায়ীগণ পুণ্যহীন বাক্য ও নীতিহীন বাক্য দ্বারা জনগণকে পাপ কার্য্যে উৎসাহিত করেন এবং বলেন "যে যত করে

পাপ, টাকার কল্যাণে সব হয়ে যায় মাফ” ইত্যাদি। ইহারা সৎপথ প্রদর্শক নহে, ভণ্ড। যেহেতু শান্ত চরিত্র, সৎকর্ম অনুরাগি ব্যক্তিই মানববাচ্য”।[১]

২. উসুলে সাবআ বা 'তাকওয়া' অর্জনের সপ্ত অনুশীলন :

আল-কোরআন, হাদিস শরিফ, নবিজী (দ.) ও তাঁর পত্নীগণ, কন্যা মা ফাতেমা ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণের একেবারে সহজ, সরল, নির্বিলাস, মিতব্যয়ী, পারিবারিক সহযোগিতাসমৃদ্ধ জীবনাচার থেকে শুরু করে মহান তাপস, সুফি প্রবর, ওলি-আল্লাহ্রা সাদা-মাটা জীবন যাপন ও পবিত্র উন্নত চিন্তাপূর্ণ কর্মের মধ্যে (Plain living and high Thinking) মূলত তাকওয়াসমৃদ্ধ জীবনের উদাহরণ রেখে গেছেন। তাজকেরাতুল আউলিয়া গ্রন্থ, হযরত দাতাগঞ্জে বখ্শ (র.), হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত ইমাম গাজ্জালীর (র.) জীবনঘনিষ্ঠ রচনাবলিতে তাকওয়া অর্জনের সরল পথের রেখা অঙ্কিত রয়েছে। এছাড়া দর্শন জগতের রথী-মহারথী-পুরোধারা সহজ সরল জীবন যাপনের জাগতিক, মনস্তাত্ত্বিক, পারলৌকিক কল্যাণের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সাধনা-গবেষণা ও পরীক্ষিত এই তাকওয়াপূর্ণ জীবন-পদ্ধতি বিংশ শতাব্দী পরবর্তী মানবমণ্ডলীর জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, খোদ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দৃশ্যমান পার্থিব জীবন তাকওয়াপূর্ণ উসুলে সাবআর ফলিত দৃষ্টান্ত।

৩. তাক্ওয়া :

'তাক্ওয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ বেঁচে থাকা, কর্মে সতর্কতা অবলম্বন করা, আল্লাহ্ভীতি, পরহেজগারী, বিরত থাকা, রক্ষা করা, আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম ইত্যাদি। “আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর আদেশ পালন এবং নিষেধাজ্ঞা অর্জনকেই তাক্ওয়া বলা হয়”। তাক্ওয়ার শাব্দিক ব্যঞ্জনা ব্যাপক। ধর্মীয় বিষয়াদিসহ মানব জীবন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তাকওয়ার ধারণা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসে পড়ে। শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্র ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে অবস্থান করে আল-কোরআন ও সুন্নাহ্র নির্ধারিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করার নামই তাকওয়া। যে ব্যক্তির মধ্যে তাক্ওয়া থাকে তাঁকে 'মুত্তাকী' বলা হয়। আল-কোরআনের সূচনাতেই সূরা বাক্বারার ২নং আয়াতে 'মুত্তাকী' শব্দটা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং

আল-কোরআনকে ‘মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক (হুদাল্লিল মুত্তাকীন) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মুহাম্মদ আলী থানভীর (মৃত্যু ১৭৪৫ খ্রি.) ভাষায়, “তাক্ওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো শংকার বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থেকে আত্মরক্ষা করা। শরিয়তের আদেশ মেনে চলা ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে দূরে থাকা। অন্যভাবে বলা যায়, পাপ থেকে এবং এর প্রতি আকর্ষণ করে এমন কাজ তথা গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাকা।”

সুফিদের পরিভাষায়, “স্বীকৃত প্রসিদ্ধ অর্থে আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় কিছু থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া।” এ ক্ষেত্রে হযরত রাবেয়া বসরীর (র.) কালাম প্রণিধানযোগ্য। “তোমার অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু অনুভব করতে না পারাই তাকওয়া।”[২]

মানুষের ব্যক্তি জীবনে সদগুণাবলির মধ্যে তাক্ওয়ার স্থান সর্বোচ্চে। ‘তাক্ওয়ার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। তাকওয়া কেবল একটি নৈতিক গুণ মাত্রই নয়, বরং সকল প্রকার নৈতিকতার (Moral values) ভিত্তি। কারণ, তাক্ওয়া মানুষকে সকল প্রকার কাজ-সুন্দর, সুষ্ঠু, কল্যাণমূলক ও সফলভাবে করার প্রেরণা যোগায়। যার মধ্যে তাক্ওয়া থাকে অর্থাৎ মুত্তাকি, সে পার্থিব লোভে কোন মন্দ কাজ করতে কিম্বা ভাবতে পারে না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি সততা, পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য, শোকর, ন্যায়পরায়ণতা, যুক্তিসিদ্ধ বাস্তবতা, সহনশীলতা, আত্মসংযমী, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বিমুখতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকেন তিনিই মুত্তাকী। আল-কোরআনে একেবারে শুরুতেই মুত্তাকীর প্রাথমিক সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে: “যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখেন, সালাত কায়েম করেন এবং আমি তাঁদেরকে যে রিজিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করেন। আর যারা আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবে ঈমান রাখেন এবং আখেরাতের উপর পুরা একীন বা বিশ্বাস রাখেন। তাঁরাই রবের হেদায়েতের উপর রয়েছেন এবং তাঁরাই সফলকাম (মুফলিহুন) (২ : ৩-৫)।

৪. তাক্ওয়া সূত্রের মাইজভাণ্ডারী সংস্করণের বাংলা বয়ান :

অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থসহ বিভিন্ন পুস্তিকায় উসুলে সাবআর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করে সর্বদা ভক্তদেরকে এ বিষয়ে ওয়াকেবহাল রেখেছেন। তাঁর সন্তানগণ এবং উত্তরাধিকারীরও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে এ বিষয়টিকে গতিশীল রেখেছেন। ব্যক্তি জীবনে ব্যক্তিগতভাবে সহজে অনুশীলনযোগ্য এই নীতিমালাকে সামষ্টিকভাবে অনুশীলন ও পালনের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে তিনি “আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী” নামে সংগঠন তৈরি করেন, যাতে তাঁর সাংগঠনিক মানস ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই আঞ্জুমানের গঠনতন্ত্র সর্বাংশে কল্যাণমুখী এবং বিংশ শতাব্দী ও উত্তর কালের সাধারণ সমাজবদ্ধ মানুষের শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবন যাপনের অনুকূল পথ ও আচরণের দিশা প্রদান করে।

উসুলে সাবআ তথা তাকওয়া অর্জনের পন্থাসমূহের বাংলা বয়ান, যা অছিয়ে গাউসুল আযম কর্তৃক প্রণীত ও ক্রমাগত মুদ্রিত (দ্রষ্টব্যঃ বেলায়তে মোত্লাকা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, আলোকধারা বুক্স, ২০২১ খ্রি.)।

উসুলে সাবআ বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি

ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর :

(ক) “ফানা আনিল খাল্ক”– অর্থাৎ কাহারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যাহার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে।

(খ) “ফানা আনিল হাওয়া”– অর্থাৎ যাহা না হইলে চলে, সেইরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা; যাহার ফলে জীবন যাত্রা সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয়।

(গ) “ফানা আনিল এরাদা”– অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা, যাহার ফলে ছুফী মতে “তছলীম ও রজা” হাছিল হয়।

'মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যু :

(ক) "মউতে আবয়্যাজ"– অর্থাৎ সাদা মৃত্যু। ইহা উপবাস এবং সংযমে আয়ত্ব হয়; যাহার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন, রমজানের রোজা বা নফল রোজা ইত্যাদি উপবাস ও সংযম পদ্ধতি। মহাত্মা গান্ধী কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলে উপবাস করিতেন এবং বলিতেন "উপবাসে আমি আলো পাই।"

(খ) "মউতে আছওয়াদ"– অর্থাৎ কাল মৃত্যু। ইহা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাছিল হয়। কারণ, অন্যের সমালোচনা বা নিন্দার পর মানব যখন নিজের মধ্যে উল্লেখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজিয়া পায়, তখন নিজকে উক্ত দোষ হইতে সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায়। যদি অন্যের আরোপিত দোষ নিজের মধ্যে খুঁজিয়া না পায়, নিজকে দোষমুক্ত বলিয়া স্থির নিশ্চিত হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালার নিকট শোকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হইয়া নিজের ব্যক্তিত্বে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখিতে পায়। সমালোচনাকারীকে তখন বন্ধু বলিয়া মনে করে।

(গ) "মউতে আহ্মর"– অর্থাৎ লাল মৃত্যু। ইহা কামভাব ও লালসা হইতে মুক্তিতে হাছিল হয় এবং বেলায়তপ্রাপ্ত হইয়া অলীয়ে কামেলদের মধ্যে গণ্য হয়।

(ঘ) "মউতে আখজার"– অর্থাৎ সবুজ মৃত্যু। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইলেই ইহা হাছিল হয়। যাহার ফলে মানব-অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কামনা-বাসনা থাকেনা। ইহা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত।

এই কোরআনী হেদায়তের সপ্ত পদ্ধতি, মানব জীবনের এক নিখুঁত সহজ সরল ও স্বাভাবিক পন্থা; যাহা মানব জীবন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে।

৫. তাক্ওয়া আধ্যাত্মিক ওরুজ বা উন্নয়নে সহায়ক :

মানুষের ব্যক্তিজীবনের সদ্গুণাবলির মধ্যে তাক্ওয়া অন্যতম। তাক্ওয়ার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটে। তাক্ওয়া একটি নৈতিক গুণই শুধু নয়, বরং সকল নৈতিকতার ভিত্তি। কারণ, তাক্ওয়া মানুষকে সকল কাজ সুন্দর, সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে। যার মধ্যে তাক্ওয়া থাকে, তিনি পার্থিব লোভে কোন খারাপ কাজ করতে পারেন না। তিনি পার্থিব

সামষ্টিক জীবনের ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

মুসলিম মনীষী, দার্শনিক ও সুফিগণ তাক্ওয়ার বিভিন্ন স্তর বা সোপান রয়েছে বলে অভিমত পোষণ করেন। ইমাম গাজ্জালী (র.)-এর মতে তাক্ওয়ার সোপান চারটি:

(১) শরিয়তে যে সকল বস্তু হারাম বলে নির্দেশিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র ভয়ে সে সকল বস্তু থেকে বিরত থাকা। যেমন মদ্যপান, সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। এটি সাধারণ মু'মিনের তাকওয়া। এ শ্রেণির মুত্তাকীগণকে 'মু'মিনীন' বলা হয়।

(২) শরিয়তে হারামকৃত সকল বস্তু থেকে বিরত থাকার পর সন্দেহযুক্ত হালাল বস্তুগুলো থেকে বিরত থাকা। রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এ সম্পর্কে বলেন, "যে বস্তু তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা বর্জন করো, আর যাতে তোমার সন্দেহ নেই তা গ্রহণ করো।" যেমন কেউ তোমাকে কিছু খেতে দিলো। এ খাদ্য ঐ ব্যক্তি হালাল উপার্জন দ্বারা প্রস্তুত করেছে না হারাম উপার্জন দ্বারা, তা তোমার জানা নেই। সুতরাং, সন্দেহ রয়েছে বলে তুমি তা গ্রহণ করলে না। এ শ্রেণির মুত্তাকীগণকে 'সালিহীন' বলা হয়।

(৩) শরিয়তের যাবতীয় হারাম বস্তু এবং সন্দেহপূর্ণ সকল হালাল বস্তু থেকে দূরে থাকার পর, আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে, অনেক সন্দেহবিহীন হালাল বস্তুও পরিত্যাগ করা। রাসুলুল্লাহ্ (দ.) বলেন, "যতক্ষণ মুসলমান সন্দেহপূর্ণ বস্তুতে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় সন্দেহবিহীন বস্তুও বর্জন করবে না, ততক্ষণ সে খাঁটি মুত্তাকী হতে পারবে না।" এ শ্রেণির মুত্তাকীগণকে 'আত্কিয়া' বলা হয়।

(৪) উপরে বর্ণিত তিন শ্রেণির তাক্ওয়া আয়ত্ত করার পর এমন সব হালাল বস্তুও পরিত্যাগ করা যা ইবাদত-বন্দেগীতে কোনো সহায়তা করে না। এ শ্রেণির মুত্তাকীগণকে 'সিদ্দীকীন' বলা হয়। যেমন, একদা এক বুযুর্গ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঔষধ সেবন করার পর

তার স্ত্রী তাকে বললেন, 'কিছুক্ষণ পায়চারি করুন'। তিনি উত্তর দিলেন, 'অনর্থক' কাজ করা জায়েয নয়। আমি যাবতীয় কাজের হিসাব করে থাকি। এ পায়চারি করার মধ্যে 'ইবাদতের কোনো উপকারিতাই দেখছি না। সুতরাং, আমি এমন কাজ করতে রাজী নই।

বর্তমানে সমস্যা সংকুল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মানুষের মধ্যে যতদিন না ব্যাপকভাবে তাক্ওয়া সৃষ্টি হবে, ততদিন মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গল আশা করা যায় না। তাই বলা যায়, তাক্ওয়া হলো মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের মুক্তি ও নাযাতের মূল চাবিকাঠি।[২]

৬. ইশ্ক-ই-ইলাহী ও খিদমত-ই-খাল্ক চর্চায় তাক্ওয়ার গুরুত্ব :

তাক্ওয়া এতো ব্যাপক বিষয় যে, সেটাকে আল-কোরআনের সূচনাতেই স্থান দেওয়া হয়েছে (২:২)। এর পরবর্তী আয়াতে মুত্তাকীদের সংজ্ঞায় ঈমান ও সালাতের পরই 'রিযিক' থেকে ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য কোরআনের অন্য কতিপয় সূরায় ব্যয় খাতও বর্ণিত হয়েছে।

গড়পড়তা মানুষের মানস গঠন ও আচরণ সম্পর্কে বিচারপতি আবদুল মওদুদ বলেন, "মানুষ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আড়ম্বড়ের দিকেই সমধিক নিষ্ঠাবান। সোজাসুজি হৃদয়ের কারবার খুবই কম। তার দরুন এবাদত-ই-ইলাহীই মানুষের ধর্মাচারের প্রধান অঙ্গ; ইশ্কে-ইলাহীর স্থান খুবই সঙ্কীর্ণ। সেই রূপ 'খিদমত-ই-খাল্ক' বা সৃষ্টির সেবার স্থান মোটেই নেই। সৃষ্টিকে উপেক্ষা করে, এমনকি বঞ্চিত করে 'খালেক' অর্থাৎ স্রষ্টার তুষ্টিই কাম্য হয়ে উঠেছে। আবার সত্যিকারের ধর্মাচারের চেয়ে ধর্মাচারের ভান ও ভণ্ডামীতে মানুষের হৃদয়-মন ছেয়ে যাচ্ছে।"[৩] লক্ষ্যণীয় যে, অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মানব সাধারণের পরস্পর বিরোধী এই দ্বৈত অভিব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে প্রকৃত মানুষ হবার তালিম স্বরূপ 'উসুলে সাবআ'র সংক্ষিপ্ত প্রেসক্রিপশন পেশ করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, মানুষের দ্বৈত অভিব্যক্তির শেকড় নিহিত রয়েছে তার পার্থিব বাস্তব জীবনে। আল-কোরআনের ভাষায় 'মানুষের এই পার্থিব জীবনও খেলা-তামাশার বিষয় নয়।' বিভিন্ন বিষয় ও মানদণ্ডে মানুষের শ্রেণি বিন্যাসের যে খতিয়ান আল-কোরআনের বয়ানে রয়েছে, তাতে (ক) ভালো-মন্দ, (খ) ভালোর বিভিন্ন স্তর, (গ) আর্থনীতিক শ্রেণি বিন্যাস, (ঘ) সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস, (ঙ) ধনী-দরিদ্রের বিভেদ ও পরিচিতি, (চ) পাপী, (ছ) মোনাফেক, (জ) সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বা কাফির প্রভৃতি বিবিধ প্রকার শ্রেণির কথা বিবৃত হয়েছে। মহান সুফি সাধকরা এই বাস্তবতার প্রতি অত্যন্ত সচেতন এবং তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও নসিহত পদ্ধতিতে এগুলো সম্পর্কেও সহজে পালনযোগ্য তালিকা ও ধারণা দেওয়া হয়। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তও এর ব্যতিক্রম নয়। 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থের মারিফাত, তাসাওউফ শিক্ষার পাশাপাশি 'ধনতন্ত্র ও নাস্তিক্যবাদ'র বিলোপ, 'ধনসাম্য'-এ উৎসাহ প্রদান, 'বর্ণ বৈষম্যবাদ', 'আঞ্চলিকতাবাদ' 'অতি সঞ্চয় প্রবণতাজনিত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা' প্রতিরোধ ও নিরুৎসাহিতকরণ, 'ধন সঞ্চয় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-বিরোধ, ধন-সম্পদ স্ফীতি বিরোধী নীতি' ও 'অভাবমুক্ত জীবন ও সমাজের সপক্ষে আনুকূল্য'র উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এসব নীতি বিন্যস্ত করার পটভূমি হিসেবে সূরা হাশরের ৭নং আয়াত (যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, কেবল তাদের মধ্যেই ধন সম্পদ আবর্তন না করে) উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, "তোমাদের ধনীদের মধ্যে অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় হোক, আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন না" ('সুফি সভ্যতা দিশারী' অনুচ্ছেদ, বেলায়তে মোত্‌লাকা)।

নবিজী হযরত মুহাম্মদ (দ.) স্বীয় বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে দেখতে পেয়েছিলেন যে, মানুষের অর্থনৈতিক জীবন তার সমগ্র অস্তিত্বের সাথে সহব্যাপ্ত এবং অন্য সব মূল্য (Values) এটা থেকেই উৎসারিত হয়। তিনি আধুনিক শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজতত্ত্ববিদ-অর্থনীতিবিদদের মতোই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন যে, অর্থনৈতিক জীবন আধ্যাত্মিক বা অর্থনীতি বহির্ভূত মূল্যের অগ্রগতি/পশ্চাদপসরণের উপর প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন যে, মানুষের জীবনের মর্যাদা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যতীত রক্ষা করা যায় না। **আর সামাজিক ন্যায়বিচার খুবই বেশি পরিমাণেই নির্ভর করে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের উপর**। তিনি এমন এক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছিলেন,

যার দ্বারা সমাজকে বিত্তহীন ও বিত্তবান এই দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। সমস্ত সম্পদ (আজকের ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জগতের মতো) জনা কয়েক ব্যক্তির কুক্ষিগত হবার পথ বন্ধ করা হয়েছিল। **নবিজী (দ.) তাঁর সমকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছিলেন। কিন্তু যে প্রশস্ত নীতির উপর তাঁর ব্যবস্থা বা পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত, তা ভবিষ্যৎ প্রয়োগেরই ভিত্তি**।

বর্তমান সমাজবিদরা জীবনের আর্থিক বিষয়ের উপর যথার্থভাবেই জোর দেন। এক শ্রেণির সমাজতন্ত্রী/বস্তুবাদী অর্থনীতিবিদরা বলেন যে, নৈতিকতা, কলা ও ধর্ম সমেত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্য সব দিকই এমন এক বস্তুর উপফল, যাকে তারা নাম দিয়েছেন উৎপাদন-ব্যবস্থা বলে।

"ইসলামের পূর্বে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে বাদ দিয়ে ধর্ম তার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে জোর দিয়েছিল। ধনীদেরকে গরিবের উপর সদয় হবার উপদেশ দেওয়া হতো। ধার্মিকতা বলতে দারিদ্র্যকে বুঝাতো। প্রচার করা হয়েছিল যে, দরিদ্রেরা সহজে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। উটের পক্ষে সূঁচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া যেমন কঠিন, ধনীদের স্বর্গে প্রবেশ করা এর চেয়েও কঠিন হবে। ধার্মিক ব্যক্তি এ সংসারের সব কিছু ছেড়ে দেবে, এটাই ছিল সবার ধারণা। এই মিছে দুনিয়ায় তার যা কিছুর অভাব, পরলোকে তার ক্ষতিপূরণ সে পাবে। গরিবদের কিছুক্ষণের জন্য ধৈর্য্য ধরে সহ্য করে থাকতে বলা হতো, কেননা এ জগত বস্তুত খুবই ক্ষণস্থায়ী। প্রথম যুগের খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করতেন যে, এই পৃথিবীর সমাপ্তি খুবই নিকটবর্তী। যখন সমগ্র জিনিসই খুব শীঘ্র চলে যাচ্ছে, তখন এই জাগতিক জিনিসের জন্য এত মাথাব্যথা কেন? যীশু বলেছিলেন যে, মানুষ কেবলমাত্র রুটি খেয়ে বাঁচে না। আত্মার জীবিকার প্রয়োজন বেশি। কিন্তু যেহেতু প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টানরা খুব গরিব ছিলেন, তাই তাদের দৈনন্দিন আহারের জন্য তারা আল্লাহ্‌র কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাইতেন। বুদ্ধ ধর্মেও ধার্মিক ব্যক্তি শ্রমজীবি নন। তিনি হলেন একজন ভিক্ষু বা দরিদ্র ধার্মিক ব্যক্তি, যিনি শ্রমজীবিদের দয়ার দানে বেঁচে থাকেন। এ সমস্ত ধর্ম পৃথিবীকে মায়া কিংবা শূন্যগর্ভ বলে ত্যাগ করেছিল এবং ধনী ও দরিদ্র উভয়ের প্রতি শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছিল। এ সমস্ত ধর্ম ব্যক্তিগত দানের পুণ্যের কথা প্রচার করেছিল। তারা এমন কোন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করেনি, যাতে শোষণ বন্ধ করা সম্ভব না হলেও শোষণ করা অন্তত কঠিন হতো। ইসলামের নবি

ছিলেন বাস্তব আদর্শবাদী। তিনি একথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, তত্ত্বগত ও কাল্পনিক আদর্শবাদ সাধারণ মানুষের খুব কম উপকারেই আসে। ইসলামের সমগ্র পরিকল্পনায় শরীরের সঙ্গে আত্মার যোগাযোগ রয়েছে। আত্মা শরীরের উপফল নয়, কিন্তু আত্মিক ও শারীরিক দিকের মধ্যে এতই পারস্পরিক যোগাযোগ রয়েছে যে, একটাতে যা কিছুই হোক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যটাতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। **আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জগত হলো প্রকৃত জগত। প্রকৃতির সব কিছুই আল্লাহ্‌র দান, আর তা তাঁর সৃষ্ট জীবের ভোগের জন্য।** দৈহিক জগতের উপরেও যে আরও সত্তা রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু দৈহিক জগতও তার নিজস্ব উপায়ে নিজেই আত্মিক। আত্মার সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য শরীর যাতে সবল, পবিত্র ও উপযুক্ত হতে পারে, সে জন্য শরীরের যত্ন অবশ্যই নিতে হবে। **নবি (দ.) সকল সৎ কাজকেই উপাসনায় পরিণত করেছিলেন।** তিনি বলেছেন যে, "যে মানুষ তার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য কাজ করে, সে আল্লাহ্‌র উপাসনা করে। উপার্জনশীল ব্যক্তি হলো আল্লাহ্‌র বন্ধু।" রাসুলুল্লাহ্-ই (দ.) হলেন প্রথম মহান ধর্মীয় শিক্ষক যিনি পরিষ্কার ভাষায় বলে ছিলেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য দারিদ্র্য একটা বড় দোষ। তিনি বলেছেন, **"দারিদ্র্য মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়।"** ঐশীবাণীতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, 'মুহাম্মাদ (দ.)-এর প্রতি বর্ষিত আল্লাহ্‌র অন্যতম আশীর্বাদ হলো এই যে, **তিনি ধনাঢ্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁকে আল্লাহ্ অভাব থেকে মুক্তি প্রদান করেছিলেন**।' রাসূলুল্লাহ্‌র (দ.) এটি একটি প্রখ্যাত বাণী যে, **'দারিদ্র্য উভয় জগতে মানুষের মুখ কালো করে দেয়; সুতরাং একে দূর করার সকল প্রকার চেষ্টা করতে হবে।'** কিন্তু তাঁর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এটা হলো মাত্র একটি দিক। তিনি বেশি না হলেও সমভাবেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, যা তার অধিকারীকে বিলাসপরায়ণ, খেয়ালী ও অবিচারক করে তোলে: **"আমি তোমার দারিদ্র্যের জন্য ততটা ভীত নই, যতটা তোমার ধনের জন্য ভীত।"** একজন মানুষ তার অন্যায়ভাবে সঞ্চিত ধনের জন্য ততটা নিচে নেমে যায়, যতটা নিচে সে দারিদ্র্যের জন্য নামে। অর্থনৈতিক পর্যাপ্ততা ও নিরাপত্তার মধ্যপথ হলো সামাজিক ন্যায়-বিচার ও সঠিক সংস্কৃতির পথ।

হযরত মুহাম্মাদ (দ.) **আর্থিকভাবে মানুষকে স্বাধীন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।**[৪] মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারই পোষকতা করে, যা 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত রয়েছে।

টীকা:

১. বেলায়তে মোত্‌লাকা : ৮ম পরিচ্ছেদ।
২. ইসলামী পরিভাষা, ড. সৈয়দ শাহ এমরান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, মার্চ, ২০১৮ ইং।
৩. শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই, [১৬৮৯ খ্রি.–১৭৫২ খ্রি. সিন্ধুর মহান সাধক] আবদুল মওদুদ, ঢাকা, ১৯৬৪ ইং।
৪. Islamic Ideology; Dr. Khalifa Abdul Hakim, 1970, Dacea/lahore. (এ বিষয়ে আরো বিশদ অবগতির জন্য অধ্যয়নযোগ্য)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

‘বেলায়তে মোত্‌লাকা’ গ্রন্থে প্রতিভাত তৌহিদী দর্শন

১. গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) রচিত ‘বেলায়তে মোত্‌লাকা’ গ্রন্থটা ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, মানুষের প্রত্যাশিত দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারতত্ত্ব এবং একই সাথে অধ্যাত্মতত্ত্বের সুচয়িত ও সুগ্রথিত বিষয়াদির একটা মুক্তার মালা। এই গ্রন্থটাকে আখেরি নবি হযরত মুহাম্মদ (দ.) প্রবর্তিত ও ফলিত শরিয়তের শ্রেয়তার তত্ত্ব-যুক্তি-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সহজবোধ্য কুঞ্জিকা বলা চলে। অন্য কোন ধর্ম, ধর্মাচার, মতবাদকে আহত না করে এই গ্রন্থে মুহাম্মদী শরিয়ত তথা ইসলামকে উপস্থাপন করা হয়েছে তাঁর সময়কাল অর্থাৎ খ্রিস্টীয় বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-সামাজিক বিবর্তন, বাস্তবতা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে।

এই গ্রন্থে বিন্যস্ত পনেরোটি পরিচ্ছেদে আল-কোরআন এবং পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের রেফারেন্সে মানবজাতি ও সভ্যতার সূচনা থেকে সর্বসাম্প্রতিক বিবর্তন ধাপ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক, দার্শনিক, ধর্ম ও সমাজতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার অনেকটা তুলনামূলক বা ক্রিটিক্যাল বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক স্বরূপ এই পুস্তকে

চিত্রিত। উপসংহারে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যন্ত্র শিল্প ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিংশ শতকীয় উন্নয়ন ধারাকে আরো শাণিত ও মানব কল্যাণমুখী তথা সৃষ্টির কল্যাণমুখীভাবে এগিয়ে নেবার তাত্ত্বিক পথ নির্দেশও করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চা ও দর্শন গ্রন্থমালায় একটি বিশিষ্ট সংযোজন বটে। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন তত্ত্বের পাশাপাশি সামাজিক সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা ও সৌকর্য চিত্রন এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২. তৌহিদ তথা মানবজাতি-তথা মহাসৃষ্টির অভিন্নতা ও একত্ব নির্দেশে সাফল্য এই গ্রন্থের অমূল্য সম্পদ :

আল-কোরআনের আলোয় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ তথা ধারাবাহিকতার সূত্র পাঠকের হাতে তুলে ধরতে সক্ষম এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থ। বিধান ধর্ম (Legislation) ও আচার ধর্মের (Ritual) মধ্যে সম্পর্ক এবং মানব সমাজে এই দুটোর প্রয়োজনীয়তা, অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা কিম্বা নফল হিসেবে গ্রহণের পশ্চাদপট সম্যক তুলে ধরা হয়েছে। তৌহিদ নীতির ফলিত ক্ষেত্রে বিধান ও আচার দুটোই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শাব্দিক অর্থে আল্লাহ্‌র একত্ব বুঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তৌহিদের চারটি স্তর রয়েছে; (ক) তৌহিদ ফিয্‌-যাত (একত্ব), (খ) তৌহিদ ফিস্‌ সিফাত (গুণগত একত্ব), (গ) তৌহিদ ফিল্‌-হুকুম (আইনগত একত্ব) (ঘ) তৌহিদ ফিল্‌-ইবাদত (ইবাদতগত একত্ব)। তৌহিদ বিষয়টি ইলমুল কালাম-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁর গুণাবলি সম্পর্কিত বিজ্ঞানকেই 'ইলমুল কালাম' বা ধর্মতত্ত্ববিজ্ঞান (Science of Religion) বলা হয়। তৌহিদই ইসলামে ঈমান বা বিশ্বাস এবং যাবতীয় কর্মনীতির মূল ভিত্তি।

৩. তৌহিদে আদ্‌ইয়ান :

"ফেরেশ্‌তাগুণ বিশিষ্ট জবরূত শক্তি অর্জনে খোদার সহিত নিছবত বা সম্বন্ধ সমূহ সৃষ্টি করিতে সুফি সাধনায়রত বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত ও পথ বা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি থাকিলেও সকলের মূল লক্ষ্য এক।[১] অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেন, "কওলুল জমীলের" উর্দু তরজুমা শেফাউল আলীলের সপ্তম অধ্যায়ে নফ্‌ছের হাকীকতের বর্ণনা দিতে গিয়া মওলানা শাহ্‌ অলীউল্লাহ্‌ দেহলবী ছাহেব লিখিয়াছেন :

“নফ্‌ছ বা মানবসত্ত্বাতে এক স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করা ছুফী সাধনার সমস্ত পন্থার মূখ্য উদ্দেশ্য। এই স্থিতিশীল অবস্থাকে ছুফী পরিভাষা মতে নিছবত বা সম্বন্ধ বলা হয়। ইহা নফ্‌ছ বা মানবসত্ত্বার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতাজনিত আয়ত্ব বস্তু বিশেষ। ইহার দ্বারা খোদা তাঁহার শান্তি ও আলো-জগতের সহিত মানবের ধারাবাহিক ও নিকটতম যোগাযোগ সৃষ্টি করেন। ইহাতে ফেরেশ্‌তা জগত গুণবিশিষ্ট বা তদূর্ধ্ব জব্‌রূত জগত অবগতি জনিত হাল বা অবস্থা আয়ত্ব হয়।

ইহার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, যখন অনুগত বান্দা এবাদাত, পবিত্রতা এবং খোদা স্মরণে তাহার “নফ্‌ছ নাতেকা” বা কথাবার্তার শক্তিসম্পন্ন সত্ত্বাতে স্থিতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিশিষ্ট জ্যোতিঃ হাছেল করে, তখন তাহার মধ্যে তাওয়াজ্জোহ বা প্রভাবশালী ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ হয়।

প্রথম, পবিত্র মহব্বত বা ভালবাসার সম্বন্ধ অর্থাৎ এশ্‌ক। এই ভালবাসা বা এশ্‌ক যখন মানবের ক্বল্‌ব বা অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন “কছরে নফ্‌ছ” বা প্রবৃত্তির ধ্বংসকারী রূপে খোদা পথচারীকে নফ্‌ছের কাম্য বস্তু হইতে বিরত করিতে দেখা যায়। ইহা মালামিয়া কাদেরী আহ্‌মদী সপ্ত পদ্ধতিতে পূর্ণ ব্যক্ত।

দ্বিতীয়, মোশাহেদার নিছবত বা সম্পর্ক দ্বারা। ইহা অচিন্ত্য ও অব্যক্ত খোদাকে ধ্যান করা বুঝায়। ছুফী পরিভাষা মতে ইহাকে “মোজার্‌রাদে বছিত্‌” বা একক শক্তির ধ্যান বলা হয়।

ইহারা নিয়ম পদ্ধতির দিক্‌ দিয়া বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্যের দিক্‌ দিয়া অভিন্ন। মওলানা বলেন ঃ– তাঁহারা “খতিরাতুল কুদছ” অর্থাৎ পবিত্র প্রেরণাস্থলে পরস্পর হাত মিলাইয়া আছেন। ইহারা সবাই তৌহীদে আদ্‌য়্যানের বা ধর্ম-সাম্যের সমর্থক এবং ‘ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের’ স্বীকৃতিদাতা।”

তিনি ‘বেলায়তে মোত্‌লাকা’কে তৌহিদে আদ্‌য়্যানের সমর্থক হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এর সপক্ষে সূরা বাক্বারার ৬২নং আয়াতের উদ্ধৃতি সহকারে দার্শনিক-মানবিক প্রেক্ষাপটে বলেন,

“যাহারা খোদা বিশ্বাসী এবং যাহারা ইহুদী, নাছারা (খ্রিস্টান) বা ছাবেয়ীন, যেই হউক না কেন, যদি তাহারা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য্য করে

তাহার পুরস্কার আল্লাহ্ তায়ালার নিকট রক্ষিত আছে। তাহাদের কোন ভয়ভীতি এবং অনুতাপ নাই"– (সূরা বাক্বারা : ৬২)।

"মানবজাতির উপর আল্লাহ্ তায়ালা যে আমানত অর্পণ করিয়াছেন তাহা মায়ারফত ও তৌহীদই, সুতরাং ধর্ম জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই তৌহীদ ও মায়ারফতের আমানতের বোঝা বহনকারী। যদি আদায় না করে আল্লাহ্ তায়ালার আমানতের খেয়ানত হইবে। যেমন ইমাম গাজ্জালী (র.) – ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, (৩য় খণ্ড, ১৩ পৃ.) গ্রন্থে সূরা আহযাব-এর ৭২ নং আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন : "নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে এই আমানত দিতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে তা বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, কিন্তু মানুষ তা বহন করলো। মানুষ তো নিজের উপর বড়ই জুলুম করে থাকে, আর সে বড়ই অজ্ঞ" (৩৩ : ৭২)।

তিনি আরো বলেন, "ধর্মসাম্য-বা-তৌহীদে আদ্য়্যানের নিকট যে সর্বধর্ম্মের নৈতিক লক্ষ্যবস্তু এক এবং কোন ধর্ম যে ইহার নিকট হেয় নহে ইহার পোষকতায় নিম্ন আয়াতটি দেওয়া হইল:

"তোমরা কি খোদার কোন কেতাবকে বিশ্বাস এবং কোন কেতাবকে অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে এই রকম যাহারা করে বা কর, তাহারা সংসারে অপদস্থ এবং কেয়ামতের দিন কঠোর আজাবের দিকে প্রত্যাবর্ণিত হইবে। আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ তাহার সম্বন্ধে অবগত আছেন"– (সূরা বাক্বারা–৮৫ আয়াত)।

"যাহারা বলে বেহেস্তে নছারা ও ইহুদী ছাড়া অন্য কেহ যাইতে পারিবেনা; ইহা তাহাদের মনগড়া কথা। বলুন, হে মোহাম্মদ (দ.), তোমরা যদি সত্য হও, তাহলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর" (সূরা বাক্বারা–১১১)।

"বরং ইহাই সত্য; যে কেহ আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্ণিত এবং সৎকার্য্যানুরাগী হয়, তাহার জন্য তাহার খোদার নিকট পুরস্কার নিহিত। তাহাদের জন্য কোন ভয়ভীতি নাই এবং তাহারা তিক্ততাও অনুভব করিবেনা" (সূরা বাক্বারা- ১১২)।

"অতএব বুঝা যায়, ইহুদীদের মত যাহারা মনে করে বেহেশ্ত কেবল তাহাদের জন্য, তাহারাও এই হুকুমের অন্তর্গত। উপরোক্ত আয়াতসমূহের পোষকতায় "ঈমানে মোজ্মলের" মর্মার্থ দেওয়া গেল:

"আমি বিশ্বাস করি খোদা বিদ্যমান আছেন। খোদার ফেরেশ্‌তা (কর্মকর্তার সূক্ষ্মশক্তি) ও কেতাব সত্য। সমস্ত নবি বা প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি বিশ্বাস রাখি। আমি নবি বা প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে কোন তারতম্য বা ভিন্নমত পোষণ করিনা।" এই ঈমানে মোজ্‌মলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া মওলানা রূমী (র.) বলেন, পাকা ঘরের খটরকে তোপ দাগিয়া বিলীন করিয়া দাও। দেখিবে, পূর্বে খটরে সূর্য্যের পতিত আলো খটরসমূহের অনুপাতে বিভিন্নরূপে দেখা গেলেও খটর ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে সূর্য্যের আলো সমানভাবে পতিত হইয়াছে। সূর্য্যের আলোতে কোন প্রকারের তারতম্য দৃষ্ট হইতেছেনা। তদ্রূপ নবিদের বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানগত পার্থক্য যুগোপযোগী এবং তাহাদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য হইলেও মূলে নৈতিক ধর্মে ও উদ্দেশ্যে তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেবল কর্মপদ্ধতির পার্থক্য দৃষ্ট হয় মাত্র। "সূরায়ে আনকাবুত শেষ আয়াত (৬৯) মতে বুঝা যায়, যাহারা উপাস্যকে বুঝিতে ও জানিতে চেষ্টা করে এবং সৎকার্য্যানুরাগী হয়, খোদা তায়ালা তাহাদিগকে নিশ্চিত "হেদায়ত" সৎপথ প্রদর্শন করিবেন। খোদা সৎকার্য্যকারীদেরই সঙ্গী। সূরায়ে আহকাফ ১৩ আয়াতঃ "যাহারা বলে আল্লাহ্ আমাদের পালন কর্তা এবং ইহাতে আস্থাশীল থাকে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং কোনরূপ তিক্ততাও ভোগ করিবে না।"

৪. এলমে তাহ্‌কীকী ও এলমে কাশ্‌ফী :

"বেলায়তে মোত্‌লাকার অধিকারী আওলীয়াগণ বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত শরআনুযায়ী এলমে তাহ্‌কীকী ও এলমে কশ্‌ফী অনুযায়ী স্বীয় অধিকার বলে কাজ করেন। অলীয়ে কামেলের কাজ খোদার ইচ্ছা শক্তি ও হেকমত অনুযায়ী হইয়া থাকে। যেহেতু "শাইওনাতে তৌহীদী" এবং "এয়েতেবারাতে অজুদীর" নাম শরীয়ত। যাহাকে এবাদাতে মোতনাফিয়া এবং মায়ামেলাতে এয়েতেবারীয়া এবং এলমে তৌহীদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। (আয়নায়ে বারী ৭০৭/৭০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইহা রছুমে শরআর অনুরূপ না হইলেও আছলে শরআর বিরোধী নহে। বরং নবি রসূল পাঠাইবার হেকমতের পর্যায়ভুক্ত কারণসমূহের শেষ কারণ।

"তুমি যখন নবিকে মকামে শরআর বাহিরের কথা বলিতে শুন তখন মনে কর ইহা তাঁহার খোদা পরিচিতি ও অলী হওয়ার ফলে বলিতেছেন এবং এই কারণে

তাঁহার আলেমে আরেফ ও অলী উল্লাহ্ হওয়ার মর্তবা ছাহেবে শরীয়ত ও নবি হওয়ার মর্তবা হইতে অগ্রবর্তী।”

কারণ আলেম তিন প্রকার:- **(১)** আলেম বিল্লাহ্ লা-বে আমরিল্লাহ্, **(২)** আলেম বে আমরিল্লাহ্ লা-বিল্লাহ্, **(৩)** আলেম বিল্লাহ্ অ-বে আমরিল্লাহ্।

প্রথম ব্যক্তি খোদার জ্ঞান রাখেন বটে, খোদার হুকুমের খবর রাখেন না। তাই যাহারা মজ্‌জুবে মাহাজ, তাহারা শরআর তকলীফ মুক্ত, যেহেতু ভাব বিভোরতার ফলে তাহার বাহ্যিক জ্ঞান লুপ্ত।

দ্বিতীয়টি শরাহ্, শরীয়ত বিধি ব্যবস্থা বিদ্যা অবগত, খোদার পরিচয়হীন, শুধু সংসার ধর্মী। তাই মওলানা রূমী বলেন, যদি তুমি খোদার সঙ্গে মিথ্যা দুনিয়ার মোহ, লোভকে কামনা কর তাহা পাগলামী ও অসম্ভব।

তৃতীয় স্তরের আলেমই শ্রেষ্ঠ আলেম, নায়েবে নবি। ইনি খোদা জ্ঞানবান এবং আহকামেরও খবর রাখেন, যথা হযরত খিজির (আ.)।

উক্ত বেলায়তে মোত্‌লাকার অধিকারী এই তৃতীয় স্তরের অলীউল্লাহ্, বিশ্ববাসী সকল ধর্মাবলম্বীকে কাহারও আচার ধর্মে বাধা না দিয়াও নৈতিক ক্ষেত্রে একত্রিত করিতে সমর্থ। কারণ, বেলায়তে মোত্‌লাকা কোন প্রকার ধর্মীয় বিরোধকে সমর্থন করে না। বরং ইহা রোষ বিবর্জিত এবং গন্তব্য পথের মূল উদ্দেশ্য অনুসারেই বিচার করিয়া থাকে।”

৫. তৌহিদ ধারণাতীত :

‘তৌহিদ’ এমন একটা বিষয় বা বস্তু, যা সম্পর্কে ধারণা করাও ধারণাতীত। দর্শন কিম্বা যুক্তিশাস্ত্রের সকল যুক্তি এবং গণিত শাস্ত্রের সকল হিসাব-নিকাশ এ বিষয়ে অন্তহীন এক সমুদ্রে হারিয়ে যায়। কুল-কিনারাহীন এই সমুদ্র সম্পর্কে মানবসন্তানরা অন্তর্জাত একটা বোধ নিয়ে জন্মায়, তবে সে বোধের শাব্দিক প্রকাশ ঘটানো তাদের পক্ষে অসম্ভবই রয়ে যাচ্ছে। এই প্রকাশাতীত বোধ সম্পর্কে আল-কোরআনে **১১২**তম সূরায় বিবৃত হয়েছে, “বলুন, আল্লাহ্ এক, তিনি চিরন্তন স্বয়ম্ভু, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো দ্বারা জাত নহেন এবং কেহ তাঁর সমকক্ষ নহে”– (সূরা এখলাস)। তৌহিদ অর্থাৎ একক

আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে মানুষের ভাষায়-এর বেশি কিছু বলার মতো পুঁজি নেই।

তবে তৌহিদের পার্থিব, সামাজিক, প্রাকৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি জাগতিক জীবন সম্পর্কিত সুফল বা উপকারিতা মোটামুটিভাবে ভাষায় আলোচনা ও প্রকাশযোগ্য। এসব বিষয় নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যায়: **(ক)** তৌহিদের কৌটায় বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যের ঐকতান বিধৃত; **(খ)** তৌহিদী জীবনবোধ মানুষকে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে ব্যবহার করার তাগিদ দেয়, যার অবকাশ সূরা জাসিয়ার ১৩ আয়াতে বিবৃত; **(গ)** তৌহিদ মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়; **(ঘ)** তৌহিদী জীবনবোধ মানুষকে শুধু প্রকৃতির দাসত্ব থেকেই মুক্ত করে না, উপরন্তু কুপ্রবৃত্তি থেকেও মুক্তি দেয়; **(ঙ)** মানুষকে 'আশরাফুল মখলুকাত' অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। কায়িক শক্তিতে বহু জীব-জন্তুর তুলনায় দুর্বলতর মানুষ প্রজ্ঞাবলে পৃথিবীতে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, **(চ)** তৌহিদী মোহর আল্লাহ্র অস্তিত্ব মানবিক ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বলে প্রমাণের বিষয় নয়, পরিপূর্ণভাবে আত্মিক অন্তর্জাত উপলব্ধির বিষয়, যা প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে সত্য। এই উপলব্ধি বা জ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের চেয়ে কম স্পষ্ট নয়; **(ছ)** দর্শনের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, তৌহিদী সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণের যুক্তিগুলোকে পাল্টা উপসংহারহীন যুক্তির ছুরিকাঘাতে আহত করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভাস্বর বিশ্বতত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি (Cosmological argument), উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিবাদ বিষয়ক যুক্তি (Teleological argument), অস্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ক যুক্তি (Ontological argument) এবং নৈতিক যুক্তি (Moral argument) অখণ্ডনীয়ভাবে জোরালো প্রমাণিত হয়েছে, যার সামনে এ যাবৎকালীন বিভিন্ন দার্শনিকের খণ্ডিত, সূচনা উপসংহারহীন যুক্তি অসার হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে; **(জ)** বস্তুতে বস্তুতে গভীর ঐক্য বন্ধন তৌহিদী সত্তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যমুখীনতার (Teleology) বহিঃপ্রকাশ; **(ঝ)** তৌহিদ তাবৎ কল্পিত ধর্মীয় বিশ্বাসের অসারতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। যরদস্তী দ্বিত্ববাদ, গির্জার ত্রিত্ববাদ, অসংখ্য কল্পিত পৌত্তলিকতাবাদ, অবতারবাদ, প্রাণী বা বস্তুতে দেবত্ব আরোপনবাদ (Anthropomorphism) ইত্যাকার প্রমাণিত কল্পিত সব আচার

যুক্তি বিবর্জিত, স্রেফ কল্পনানির্ভররূপে প্রমাণিত হয়ে যুক্তি ও দর্শনের লড়াইয়ের ময়দানে ঘায়েল হয়ে গেছে।[২]

বস্তুতঃপক্ষে, এই মখলুকাত এবং সৃষ্টজগৎ স্বল্পজীবী মানুষের কাছে কেয়ামত পর্যন্ত রহস্যই থেকে যাবে। পৃথিবী বা প্রকৃতির দর্শন, বস্তুর বাস্তবতার পার্থিব যান্ত্রিকতা, প্রাণ বা জৈবসত্তার জগৎ, পৃথিবীর উদ্ভবের সৃজন ও বিবর্তনতত্ত্ব, বিভিন্ন প্রজাতির ধারণা, মন বা আত্মার দর্শন, বিবেক ও সচেতনতার দর্শন সব কিছু এক তাল রং-বেরঙের মেঘমালার মানুষের চিন্তার আসমানে ভেসে বেড়াচ্ছে। আসছে, আর যাচ্ছে; শুরু ও শেষ অর্থাৎ ইবতেদা-ইন্‌তেহা ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

তবে সীমিত মানব জীবনের প্রেক্ষাপটে সংক্ষেপে বলা চলে যে, আল-কোরআন তথা ইসলামের মূলনীতি থেকে উৎসারিত মুসলিম দর্শন সর্বক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রেও এই দর্শনের ব্যবহৃত পরিভাষা নৈতিক সমাজ (Moral Society)। মুসলিম দর্শন নিছক ভাববাদে পর্যবসিত নয়। এতে রয়েছে ভাববাদ-বস্তুবাদ-নীতিবাদের যুক্তিসিদ্ধ অপূর্ব সমন্বয়। মানব জীবনের বাস্তব সমস্যা, সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য, পারিপার্শ্বিক তথা আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রভৃতি জীবন কেন্দ্রিক বাস্তবধর্মীতাই এই দর্শনের উপজীব্য। পার্থিব বাস্তব জীবন বর্জিত নিছক তত্ত্বজ্ঞান মুসলিম দর্শনের লক্ষ্য নয়। মহৎ পবিত্র জীবনের পূর্ণাঙ্গ সংবিধান, মানব জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সামগ্রিক বিষয়াদি এই দর্শনের আলোচ্য ও গবেষণার উপাদান। “ধর্ম ও কর্ম, জীবন ও জগৎ, সৃষ্টি ও স্রষ্টার আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম দর্শন জন্ম দিয়েছে আধুনিক মানবতাবাদের।”[২]

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ভাষায়: “মানব জাতির উপর আল্লাহ্‌তায়ালা যে আমানত অর্পণ করিয়াছেন, তাহা মারেফাত ও তৌহিদই। সুতরাং, ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেই তত্ত্ব, তৌহিদ ও মারেফাতের বোঝা বহনকারী”।[৩] তিনি আরো বলেন, “কোরআন বিশ্বজনীন প্রগতিমূলক যুগোপযোগী ধর্ম ব্যবস্থা দিতে সমর্থ।... ইহা শেষ ধর্ম ব্যবস্থা, ইহা বিশ্ববাসীকে একই তৌহিদী শিক্ষা এবং অদ্বৈত স্রষ্টার বিশ্বাস ভিত্তিতে সকলের সমাবেশের নির্দেশ দেয়”।[৪]

ইসলাম তথা আল-কোরআনের মূলনীতি থেকে উৎসারিত ইহকাল-পরকাল বেস্টনকারী মুসলিম দর্শন সর্বক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধকে উচ্চ স্থান দিয়েছে। সমীক্ষণবাদী (Critical) বিশ্লেষণের উপসংহার এই যে, মুসলিম দর্শন নিছক ভাববাদ কিম্বা পরকাল সর্বস্বতামুখী উপাসনা-আনুষ্ঠানিকতা নয়। এই দর্শনে হাজার হাজার বছর ধরে, চর্চিত অথচ সুনির্দিষ্ট উপসংহার বিহীন রকমারী ভাববাদ, বস্তুবাদ এবং একই সাথে কোন প্রকার পরিবর্তনবিহীন শাশ্বত নৈতিকতাবোধ ও মানবিক মূল্যবোধের এক যৌক্তিক সমন্বয় সাধিত হয়েছে। মানুষের সৃজন ও জমিনে আবির্ভাব এবং রূহবিহীন মৃত অবস্থায় দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে নশর ও হাশর (পুনরুজ্জীবন ও সম্মিলনী) পর্যায় অতিক্রম শেষে অনন্ত জীবনের যে রেখাচিত্র মুসলিম দর্শনে হয়েছে, তাতে একটা বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, রূহ অবিনশ্বর একটা অদৃশ্য 'বস্তু'। প্রত্যেক বস্তু অখণ্ড-অনন্ত এক মহাজাগতিক ধ্রুবের (Cosmological constant) অংশ বিশেষ (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র Particle কিম্বা অন্য যেকোন প্রকারের এ হোক) এবং এগুলো ধ্বংস কিম্বা বিলীনতাবিহীন। মারিফাত বা দর্শনের এটা অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য।

এই গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রতিপাদনের পাশাপাশি মুসলিম দর্শন বাস্তব পার্থিব জীবনে দৃশ্যমান আটপৌরে সমস্যাদি, মানুষের নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি, প্রাণী জগতের প্রতি, চারি পার্শ্বস্থ বস্তুজগতের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যাদি, সমাজ-স্বদেশ-বিশ্ব তথা আন্তর্জাতিক বিষয়াদি প্রভৃতি জীবনকেন্দ্রিক পার্থিব বাস্তববাদী আলোচনাপূর্বক যুক্তিসিদ্ধ সমাধানসূত্রাদি বৃহত্তর মানব সমাজের সামনে প্রয়োজনীয় ব্যবহারযোগ্যভাবে মওজুদ রেখেছে। মুসলিম দর্শন কখনো [হযরত নূহ (আ.) থেকে প্রাক-নবিজী (দ.) কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক কালেও] কল্পনার পাখায় ভর করে ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক স্বর্গে বিচরণ করেনি। পার্থিব জীবন-বর্জিত দর্শন ও কর্মধারা এবং নিছক জ্ঞানচর্চা কখনো মুসলিম দর্শনের লক্ষ্য ছিল না এবং নয়। মহৎ জীবনের পূর্ণাঙ্গ যৌক্তিক কর্মবিধান তথা মানবজীবন ও পারিপার্শ্বিক প্রাণী ও বস্তুজগতের সামগ্রিক আলোচনা ও কল্যাণমুখী আলোচনাই মুসলিম দর্শনের উপজীব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

হযরত হাসান (রা.) সহ পাঁচ খলিফার সময়কাল বাদ দিলেও হযরত হাসান বসরী (র.), হযরত রাবেয়া বসরী (র.), হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.),

হযরত জুন্নুন মিসরী (র.), হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.), হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.), দার্শনিক মৌলানা রুমী (র.), ড. মুহম্মদ ইকবাল প্রমুখ দার্শনিক ও মহান ওলী-আল্লাহ্‌দের প্রণীত ত্বরিকায় সামগ্রিক জীবনবোধ–যুগপৎ পার্থিব বস্তুগত ও অপার্থিব অবস্তুগত (Mundane and Transcendal) এবং কালোপযোগী কর্মপ্রক্রিয়ার রূপরেখা বিবৃত, বিকশিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে; হয়ে আসছে। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা তথা বেলায়ত এই ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করে চলেছে। ধর্ম ও কর্ম; জীবন ও জগৎ, স্রষ্টা ও সৃষ্টির আলোচনা, বীক্ষণ, সংশ্লেষণ ও অনুসিদ্ধান্তের মুসলিম দর্শন সমতাবাদী তো বটেই, বরং কালোপযোগী আধুনিক মানবতাবাদের উদ্ভব ঘটিয়েছে, যা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের অন্যতম উপজীব্য, যা অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ইসলামী জীবনবোধ এবং মুসলিম বহুত্ববাদী জীবনবাদী দর্শনের সৃজনশীল প্রগতিশীল প্রকৃতি। তিনি তৌহিদী মানবিকতা ভিত্তিক গণতন্ত্র, শোষণ-পীড়ন মুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবন গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্ভীক, সোচ্চার, দিশারী প্রবক্তা।

টীকা:

১. বেলায়তে মোত্‌লাকা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: আত্মদর্শন।
২. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, প্রফেসর রশীদুল আলম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ ইং।
৩. বেলায়তে মোত্‌লাকা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
৪. ইবিড. চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম অধ্যায়

জাহেরী বাতেনী সব বিষয়ে নবিজীর (দ.) অবিনশ্বর বিশেষত্ব ও ব্যাপকতা প্রসঙ্গে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)

১. সরল পথের দিশারী নবুয়ত-রিসালাত ধারার প্রান্ত বিন্দু সম্পর্কে আল-কোরআনঃ

আল-কোরআনের সূরা বনী ইসরাইলের ৮৪নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ বলুন, 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী আমল করছে, তবে তোমাদের রবই জানেন কে সঠিক হেদায়েতের পথে রয়েছে।' এই সূরাটির ৮১নং আয়াত; কতিপয় বিজ্ঞ তফসিরকারকের মতে ৭৬-৮২নং আয়াত ব্যতীত মক্কায় অবতীর্ণ মধ্যবর্তী সূরাগুলোর অন্তর্গত। সূরা আম্বিয়ার ৯২-৯৩নং আয়াত এরশাদ হয়েছেঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের উম্মাহ্সমূহ অভিন্ন (একই) উম্মত এবং আমিই তোমাদের রব, আমারই ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের কার্যকলাপে পারস্পরিক ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে, অথচ সকলকে আমার নিকটেই ফিরে আসতে হবে।" এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ মধ্যবর্তী সূরাগুলোর অন্তর্গত। একই ক্যাটাগরির অপর এক সূরা রুম-এর ৩২নং আয়াতে বলা হয়, "তারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে, আর প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত" (৩০ : ৩২)। এই ধারাবাহিকতায় সূরা মু'মিন-এর ৫২-৫৩নং আয়াতের বর্ণনার উপর চোখ বুলানো যাক। এতেও বলা হয়েছে, "এবং নিশ্চয়ই তোমাদের উম্মাহ্সমূহ অভিন্ন (একই) উম্মত এবং আমিই তোমাদের রব,

আমাকে ভয় করো; অতঃপর তারা তাদের কাজকে (আমরাহুম) বহুধা বিভক্ত করেছে, প্রত্যেক দলই নিজের কাছে যা (লাদাইহিম) আছে, তা নিয়ে [নিজ নিজ মতবাদ-বিশ্বাস-আচরণ] সন্তুষ্ট।' এ প্রসঙ্গে সূরা শুরা-এর ১৫ আয়াতের বাণী প্রণিধানযোগ্য, যাতে বলা হয়েছে: "আপনি আপনার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের প্রতি আহ্বান করুন এবং উহাতেই অবিচল থাকুন এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না; আপনি বলুন, আমি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাবে ঈমান রাখি এবং তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহ্‌ আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব, আমাদের আমল আমাদের, তোমাদের আমল তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।" এই সূরাও মধ্যগ্রুপের মক্কী সূরা, আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতের সময়কালে (৬১৪ খ্রি.) অবতীর্ণ।

এরপর ইতিহাসের সড়ক ধরে আরো এগিয়ে দেখা যায়, ৬২২ খ্রি. ২৭ সেপ্টেম্বর সোমবার নবিজী হযরত মোহাম্মদ (দ.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় পদার্পণ করেন এবং আল-কোরআনের নির্দেশিত পন্থায় বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো কোন প্রকার ভেদ-বৈষম্যবিহীন পার্থিব (Mundane) সমাজ বিনির্মাণের দুস্তর কর্মসূচিতে হাত দেন। সবার প্রতি তিনি পরিবেশন করেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানপূর্বক সামগ্রিক কল্যাণের আবেদন এবং সেই প্রতিকূল পরিবেশে সুদৃঢ় পরিচ্ছন্ন নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান থেকে মানব-সমাজ পুনঃনির্মাণ কর্মসূচিতে হাত দেন, যা ক্রমাগত সাফল্যের পথে এগিয়ে যায়। হিজরতের কারণ, ফলাফল এবং এই একবিংশ শতাব্দীতেও এর সক্রিয়তার বহুমুখী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নব নবরূপে আবির্ভূত হচ্ছে। রোজ কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। সীমিত দৃষ্টিতে একটি বিশ্লেষণ দাঁড়ায় যে, উপরে বর্ণিত আল-কোরআনের আয়াতগুলো সূরা মোহাম্মদ-এ অবতীর্ণ বাণীর যেন পূর্ব ধাপ। ঐক্যবদ্ধ সৃজনশীল, শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ এক বিশ্ব মানবসমাজ নির্মাণের যে আকাঙ্ক্ষা, সদিচ্ছা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ব্যক্ত হয়েছিল, তার রূপায়নের সহজ পদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছে এই সূরায়। এই পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে অবতীর্ণ আয়াতে বলা হয়েছে: 'যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত সত্যে ঈমান আনে, আর উহাই তাদের রব হতে

প্রেরিত সত্য; তিনি তাদের মন্দকর্মগুলো বিদূতির করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন (৪৭ : ২)।

এই আয়াতের তাৎপর্য ও দর্শনের বিস্তার মানব সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট। মানবিক সকল প্রকার কর্ম-চিন্তা-তৎপরতায় এটা পরিব্যাপ্ত। আল-কোরআনের সূরা ফাতেহায় মানুষকে 'সিরাতুল মুস্তাকিম' বা সহজ-সরল পথ যাঞ্চা করতে শেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় সূরা বাক্বারার দ্বিতীয় আয়াতেই দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে: 'এই কিতাব সকল প্রকার সংশয়াতীত; মুত্তাকীদের জন্য পথ-নির্দেশক (২ : ২)।' আর সূরা মুহাম্মদ এর দ্বিতীয় আয়াতে এই সহজ পথের সূত্র অবহিত করে দেওয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে গত প্রায় দেড় সহস্র বছর ধরে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সত্য-সন্ধানী জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জন অগণিত মূল্যবান বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে আসছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আল-কোরআনে প্রস্তাবিত ও পরিবেশিত 'সিরাতুল মুস্তাকিম' উপস্থাপন করতে গিয়ে বহুবিধ প্রেক্ষিত, বাস্তব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সহজ ভাষায় সংক্ষেপে মানুষের জ্ঞাতার্থে পেশ করা হয়েছে।

এখানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রণিধানযোগ্য যে, সূরা মোহাম্মদ নাযিল হয় হিজরতের প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে অর্থাৎ ৬২২–৬২৩ খ্রিস্টাব্দে, যখন তিনি মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম বারের মতো বিশ্বজনীন মানবিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে বাস্তব রূপদানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বদর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি তথা ১৭ রমযান ২য় হিজরী, শুক্রবার। মদিনা সনদ স্বাক্ষরিত হয় ৬২৪ খ্রি.। হিজরী ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে নাযিলকৃত সূরা আলে-ইমরানের ৩১–৩২ আয়াতে বলা হয়: "আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা চাও, তবে তোমরা আমার তাবেদারী করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন, বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য স্বীকার করো।"

অতএব মোহাম্মদী শরিয়ত, তাঁর কর্মসূচি, তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্য, মধ্যপন্থী ব্যবহারিক আচরণ সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণকর পন্থা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করার জন্য তাবৎ মানব সমাজের প্রতি

আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, মহান দার্শনিক ঈমাম গাজ্জালী (র.), তাসাওউফ দার্শনিক হযরত দাতা গঞ্জে বখ্শ (র.), অন্যায়কারী শক্তিমত্ত ক্ষমতা দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রবল আত্ম-বিশ্বাসে প্রতিরোধে দণ্ডায়মান গাউসুল আযম হযরত বড়পীর আবদুর কাদের জিলানী (র.) প্রমুখ মহান অলি-আল্লাহ্, দার্শনিক, মানবতার সামগ্রিক কল্যাণব্রতীরা বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে বলেছেন; অন্যবিধ বহু পন্থা থাকলেও আল্লাহ্ ও শান্তি প্রাপ্তির জন্য নবিজীর (দ.) ইসলাম তথা আদর্শই সহজতর।

২. মোহাম্মদ (দ.) এবং তাঁর সামগ্রিকতা সম্পর্কে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অভিব্যক্তি :

(ক) "রসুল করিম বলিয়াছেন:- আমি মানবজাতিকে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহন করাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি বা আসিয়াছি" (সুনানে ইবনে মাজাহ্; তফসীরে ইবনে আরবী, ৪র্থ পৃষ্ঠা; ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দিন, ৩য় খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা)।[১]

(খ) "ইসলাম বিধান ধর্মের শেষ সংস্কার এবং কোরআনপাক চির-অবিকৃত ও রক্ষিত থাকায় ভুল-ভ্রান্তি মুক্ত। কোরআন সর্বযুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্ম ব্যবস্থা দিতে সমর্থ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। **মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্ব মানবতার প্রতীক।** যাহা তাঁহার বিভিন্ন হাদিস ও সুন্নত আচরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই ইসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম। লোক যেমন বাজারে যাইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের পছন্দ অনুযায়ী সওদা করিবার অধিকার আছে, সেইরূপ মানবের বিচার বুদ্ধির তারতম্যের দরুন নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মমত বাছিয়া নিবারও অধিকার আছে এবং উহার রেওয়াজও আছে। কাজেই ইহা অপরিবর্তনীয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অপর ধর্মাবলম্বীরা সেইরূপ এই ধর্মমনন প্রকৃতির সঙ্গে আচার ধর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।... ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও সর্ব ধর্মসম্মত মত এই যে, মানবজাতির চরিত্রগত অবনতিরোধ করতঃ চরিত্রবান মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি করা, যাহা নেহায়েত মৌলিক"।[২]

এই অনুচ্ছেদের সূচনায় উদ্ধৃত হাদিস শরিফে এই মৌলিক সামাজিক চরিত্র সৃষ্টির প্রতিই সুস্পষ্ট নির্দেশ করা হয়েছে।

৩. নবিজীর (দ.) প্রশংসায় জ্ঞান ও গবেষণার জগতে বরেণ্য কয়েকজন গুণীর অভিমত :

নবিজী হযরত মুহাম্মদ (দ.) সম্পর্কে সেই সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। বিপক্ষীয়রা তাদের তূণে হেন কোন তীর নেই, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও নোংরাভাবে তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করেনি। প্রতিপক্ষদের বাক্যবান বহু আগেই ভোঁতা হয়ে গেছে। অন্যদিকে বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রসারের পাশাপাশি নিত্যনতুনভাবে তাঁর মূল্যায়ন চলছে। প্রত্যেক যুগের মানুষ তাঁর জীবন-কর্ম-বাণী-উপদেশ থেকে নিজেদের সমাজে ও রাষ্ট্রে উপকারীভাবে প্রয়োগযোগ্য দিশা আহরণ করে চলেছেন। একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, নবিজী (দ.) বিষয়ক যে কোন আলোচনা তাঁর এবং ইসলামের জীবন-নীতির প্রশংসায় পর্যবসিত হয়। তেমন কিছু ঐতিহাসিক শাশ্বত তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

(ক) "এডোয়ার্ড মন্টেন্ট বলেন, ইসলাম ধর্মের নীতিগুলো জটিল সমস্যাবিহীন, সরল ও সহজে বোধগম্য। এ জন্যে এগুলো মানব হৃদয়ে স্থান লাভ করার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং বাস্তবিকই তা প্রত্যেক হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট মানব হৃদয়ে সহজেই অধিকার লাভ করে থাকে।"

(খ) "ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ফারসী থেকে বঙ্গানুবাদকৃত তাঁর অমূল্য গ্রন্থ তাপসমালা-য় বলেন; স্বর্গ-নরক কয়েকটা বিষয়ের মতগত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের (মুসলমানদের) সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ ঐক্য হইতে পারি, অন্য কোন জাতির সঙ্গে সেরূপ নয়; কেননা মুসলমানগণ অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক– কোনরূপ পৌত্তলিকতা বা অবতারবাদ ইত্যাদির সংশ্রব রাখেন না (তাপসমালার ভূমিকা)।"

(গ) "সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞান তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল তখন আরবজাতি কেবল কোরআনের পবিত্র প্রভাবেই গ্রীস দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরালোচনা করিয়া প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য জগতে দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও

সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার করেন। বিজ্ঞান যুগের বর্তমান উন্নতির মূলে কোরআনের প্রভাব যে অলক্ষিতভাবে বর্তমান রহিয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।... সুখ, দুঃখ, প্রেম ও বীরত্ব **যাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আজও আমাদের শ্রুতিগোচর** হইতেছে, তাহা প্রেরিত মহাপুরুষের [হযরত মুহাম্মদ (দ.)] প্রচারকালে জীবর্মূত মন্ত্রে বাজিয়া উঠিত। সনাতন ধর্ম (ইসলাম) প্রচারে করুণ আহ্বান **এবং কঠোর সততাই তাঁহার কেবলমাত্র সম্বল ছিল**। ইহাতে তিনি পূর্ববর্তী ধর্ম প্রচারকদের কেবলমাত্র সমকক্ষ ছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার জ্বলন্ত ঈশ্বর বিশ্বাস এবং অলৌকিক মানব প্রেম অপরাপর **সমস্ত ধর্ম প্রচারক অপেক্ষা অনেকাংশে উচ্চ ছিল**। কোন প্রকার প্রেম সঙ্গীত, পার্থিব আনন্দ, বৈষয়িক গৌরব, জাতীয় বীরত্ব অথবা পূর্ব পুরুষগণের গৌরব কাহিনী প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা অথবা মৃত্যুর পর চির বিলয়প্রাপ্ত অবস্থিতি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি কেবলমাত্র সনাতন এসলাম প্রচার করিয়াছিলেন উপরিস্থ আকাশ এবং নিম্নস্থ মর্ত্যদেশ বিদীর্ণ করিয়া স্বর্গ ও নরক, জীবন্ত ও মৃত ব্যক্তিগণের নামে শপথ করিয়া তিনি তাহার প্রচার করিয়াছিলেন (এমানুয়েল ডয়েচ Emanuel Deutsch)।"

(ঘ) ইসলামের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা প্রভাবেই পৌত্তলিকতা সমাচ্ছন্ন খ্রিস্টান জগতে মার্টিন লুথার 'ইউনিটারিয়ান প্রোটেস্টানিজম' ধর্মের প্রবর্তন করেন। পবিত্র কোরআনের শিক্ষার প্রভাবেই রাজা রাম মোহন রায় ও কেশব চন্দ্র সেন ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন (The last days in England of the Raja Ram Mohan Roy: Edited by Mary Carpenter)।

(ঙ) 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র তাঁর 'মহম্মদ চরিত' গ্রন্থে বলেন, "সত্যের বলেই তিনি (মোহাম্মদ) একাকী সহস্র শত্রু পরাজয় করিয়া গিয়াছেন। লোকে বলে তরবারিবলে মোসলমান ধর্ম জয়যুক্ত হইয়াছে। যখন মহম্মদ.. খোদেজার নিকট নিজের মর্মকথা প্রকাশ করেন, তখন তরবারি কোথায় ছিল? যখন কোরেশদিগের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় মোসলমানের বিশ্বাস ও বীর্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখন তরবারি কোথায় ছিল? যখন দলে দলে লোক বিশ্বাসের জন্য স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া মরুভূমিতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে লাগিল, তখন তরবারি কোথায় ছিল?

যখন মদিনার লোক গভীর নিশিথে তাঁহার নিকট অমোঘ প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত হইয়াছিল, তখনই বা তরবারি কোথায় ছিল? বিশ্বাস বলে মোসলমান ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। বিশ্বাস বলে বলীয়ান হইয়াই মোসলমানগণ অনন্ত শত্রু সাগরে সন্তরণ দিয়াছে।"

(চ) হযরত মোহাম্মদ (দ.) তথা ইসলামের প্রভাবেই খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে পৃথিবীতে সাম্য, সুবিচার, সাধারণতন্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, স্বাধীন চিন্তার (Rationalsm and free thinking) নব অভিযাত্রা শুরু হয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রোমের পোপকে ঈশ্বর জ্ঞান করে তার উপাসনা শুরু হয়। জ্ঞানচর্চা মাত্রই যখন ইউরোপে রাজবিদ্রোহ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন ইসলামের আলো ঐ জনগোষ্ঠীকে জ্ঞানের পথ দেখায়।

পণ্ডিত গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী, এম এ; জিএসসি মহাশয়ও আল-কোরআন, নবিজী (দ.) তাঁর আদর্শ ও সংগ্রাম সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন **(নব ভারত পত্রিকা)**, ১১শ খণ্ড, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা অগ্রহাছু ও পৌষ)।[৩]

৪. বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কিছু মনীষীর মূল্যায়ন :

(ক) "উদ্দেশ্যের মহত্ব, উপকরণের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা– যদি এই তিনটি বিষয়ই মানব প্রতিভার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের অন্য কোন মহামানবকে এনে মোহাম্মদের (দ.) সাথে তুলনা করার সাহস কার আছে?...দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্ম প্রবর্তক আইনপ্রণেতা, যোদ্ধা, মতবাদবিজয়ী, যুক্তিসঙ্গত ধর্মমতের প্রবর্তক, কুড়িটা পার্থিব সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এই মোহাম্মদ (দ.)। মানুষের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করার যতগুলি মাপকাঠি আছে– আমরা জিজ্ঞাসা করি, সেই সবগুলো যাচাই করলে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর কে আছে?"[৪]

(খ) "মোহাম্মদ (দ.) ছিলেন-সাম্যের ও মানুষের ভ্রাতৃত্বের পয়গম্বর" (স্বামী বিবেকানন্দ)।

(গ) “ইসলামের আসন অর্জিত হয়েছিল তরবারি দ্বারা নয়, তা ছিল নবির সরলতা, সম্পূর্ণ অহম বিলোপ, চুক্তির প্রতি সম্মান, বন্ধু ও অনুসারীদের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং তাঁর নির্ভীকতা” (মহাত্মা গান্ধী)।

(ঘ) “অন্ধকারে তিনি ছিলেন আলো। তাঁর জীবন এতো মহৎ আর খাঁটি যে, আমরা অনুভব করতে পারি তাঁর চারপাশের মানুষের কাছে মহাপ্রভুর বাণী বাহক হিসেবে তাঁকে পছন্দ করার মধ্যে” (এ্যানী বেসান্ত)।

(ঙ) “মোহাম্মদ (দ.) তাঁর পূর্বের যে কোন নবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য” (কমরেড এম এন রায়)।

(চ) “কলিকাতায় বসবাসকালে রামমোহন হযরত মোহাম্মদের (দ.) এক জীবনী লিখিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ওই সংকল্প কাজে পরিণত করিতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে বন্ধু এ্যাডামকে তিনি বলিয়াছিলেন, মোহাম্মদের (দ.) গোঁড়া ভক্ত ও বিরুদ্ধবাদী শত্রু এবং সমালোচক কেউই এই মহাপুরুষের প্রতি সুবিচার করেননি। মোহাম্মদের (দ.) প্রকৃত মাহাত্ম্য সম্পর্কে জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল জীবনী রচনার উদ্দেশ্য” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ধর্মের নব যুগ)।

(ছ) “স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী নবির কিছু বাণীর যে সংকলন করেছেন, আমি তা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়েছি ও উপকৃত হয়েছি। এগুলো শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং গোটা মানবজাতির অন্যতম রত্নভাণ্ডার” – মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ২৪ মার্চ, ১৯৩৮ইং কলিকাতা। তিনি আরো বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে অবহিত হতে চাইলাম, যিনি কোনো ধরনের বিতর্ক ছাড়াই মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ... আমি এ কথায় পরিপূর্ণ আস্থাবান, তরবারির মাধ্যমে ইসলাম এ অবস্থানে পৌঁছায়নি, বরং এটি রাসুলের অনাড়ম্বরতা এবং সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর রিসালাতের প্রতি মানুষের আস্থার কারণেই সম্ভব হয়েছে। তাঁর মহান গুণাবলিই তাঁর চলার পথ সুগম করেছে, সকল মুসিবত উতরে গিয়েছে। রাসুলের জীবনের দ্বিতীয় অংশ অধ্যয়নের পর আমার মধ্যে একটা অতৃপ্তি কাজ করতে শুরু করল-তাঁর মহান জীবন সম্পর্কে আরও অধিক জানতে না পারার কারণে।

(জ) মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে জন,
'এক আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নাই' কহিল যে জন,
মানুষের লাগি চির-দীন বেশ নিল যে জন,
বাদশা ফকির এক শামিল করিল যে জন,
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবি,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি
আজি মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি কলরোলে।

–কাজী নজরুল ইসলাম

(ঝ) "আমি সব সময়েই হযরত মোহাম্মদের (দ.) ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য জীবনী শক্তির কারণে উচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করে চলেছি। এটা প্রত্যেক যুগের জন্য যুগোপযোগী ধর্ম।... মোহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করছি যে; আগামী দিনে তা গ্রহণীয় হবে, যেমন আজকের ইউরোপের কাছে তা গ্রহণীয় হতে শুরু করেছে। মধ্যযুগীয় পাদ্রীগণ হয় অজ্ঞতা, নয় গোঁড়ামির মাধ্যমে তাঁকে কালো রঙে রঞ্জিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে তারা ছিল মানুষ মোহাম্মদ ও তাঁর ধর্মকে ঘৃণা করার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাদের কাছে মোহাম্মদ ছিলেন খৃস্ট-বিরোধী! আমি তাঁকে– এই সুন্দর মানুষটিকে অধ্যয়ন করেছি। আমার মতে, তাঁকে খ্রিস্ট-বিরোধী বলা তো দূরের কথা, **অবশ্যই মানবতার ত্রাণকারী** বলতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর মতো কোনো ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি এমন এক অজ্ঞাত উপায়ে এর সমস্যা সমাধানে উপনীত হতেন, যা পৃথিবীতে আনতে পারতো বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি" (জর্জ বার্নাড শ, ১৯২৯ইং)।

(ঞ) প্রফেসর আরনল্ড টোয়েনবি :

"আমি রসুলে আরাবীর সিরাত তাঁর বাছাই করা অনুসারীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। তাদের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত উচ্চ মার্গের। তারা সিরালাতে এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাঁর প্রতি প্রেরিত সকল প্রত্যাদেশ মাথা পেতে নিতে তাদের কোনো দ্বিধা হয় না। সুন্নাহ্য় লিপিবদ্ধ তাঁর জীবনাচার, যা কিনা শরিয়তবিধির উৎসও বটে, তা শুধুমাত্র ইসলামের অনুসারীদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে অমুসলিম জনগণের সাথে মুসলিম বিজেতাদের আচরণবিধির দিকনির্দেশনাও রয়েছে।"

(ট) ফরাসি লেখক হেনরি ডি ক্যাস্ট্রো :

“ইসলাম মেলামেশা, জীবনাচার ও অনুসরণপ্রীতির মাধ্যমেই প্রসারিত হয়েছে। কোনো ধরনের জোর-জবরদস্তি এতে ছিল না। এর প্রসারে দেওয়া হয়নি কোনো দূত কিংবা ধর্মপ্রচারকের নিয়োগ। একজন ব্যক্তির প্রকৃতপক্ষে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার মুহূর্তটি সঠিকভাবে নিরূপণ করা কঠিন; কেননা, ইসলাম ধীরে ধীরে মানুষের মনোরাজ্যে বিস্তার ঘটায়।”

(ঠ) রাশিয়ান ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় :

“ইসলাম ধর্মের অন্যতম মহত্ত্ব এই, এটি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রতি কল্যাণকামিতার উপদেশ দেয়। তাদের সাথে উত্তম আচরণ ও সহযোগিতার নির্দেশ প্রদান করে; এমনকি এ ধর্ম নিজ অনুসারীদের খ্রিষ্টান ও ইহুদি রমণী বিবাহের বৈধতা দিয়েছে–পাশাপাশি তাদেরকে নিজ ধর্মে বহাল থাকারও অনুমতি দিয়েছে। উজ্জ্বল দৃষ্টিশক্তির অধিকারীদের কাছে এটা সুস্পষ্ট– এতে কী পরিমাণ উদারতা প্রদর্শন করা হয়েছে।”

(ড) ইংরেজ প্রাচ্যবিদ টমাস আরনল্ড :

“ইসলামি হুকুমতের অধীনে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ বসবাসকারী বিভিন্ন অঞ্চলের খ্রিষ্টান দল-উপদলগুলোর অস্তিত্বই দৃঢ়ভাবে এ কথা প্রমাণ করে, এ খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের কী পরিমাণ উদারতা পেয়েছিল। এতদিন তলোয়ারের জোরে মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছিল বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা অত্যন্ত সুদূর পরাহত ধারণা ও সত্যের অপলাপ।... ইসলাম সর্বদা অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে উদারতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।”

(ঢ) মন্টগোমারি ওয়াট :

“আমি আশা করি, মুহাম্মদের জীবন সম্পর্কে এ অধ্যয়ন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের ব্যাপারে নতুনভাবে গুরুত্বারোপে সহায়ক হবে। ...তাঁর সফলতার পাশাপাশি স্বীয় মতবিশ্বাসের পথে নিপীড়ন সহ্য করা, তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগামী যারা তাঁকে নিজেদের নেতা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন, তাদের প্রতি সমুন্নত আচরণ-এ সবকিছু তাঁর ব্যক্তিত্বের মাঝে প্রোথিত ইনসাফ ও নিষ্কলুষতার প্রমাণ বহন করে।”

(ণ) বসওয়ার্থ স্মিথ :

"মুহাম্মদ ছিলেন একই সাথে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু তাঁর কাছে ধর্মগুরুদের মতো অহমিকা ও রোমান কায়সারদের মতো বিশাল সমরশক্তি ছিল না। ছিল না কোনো সুসংহত সৈন্যদল অথবা বিশেষ নিরাপত্তা প্রহরী কিংবা মজবুত কোনো প্রাসাদ। কারও যদি এ কথা বলার অধিকার থাকে– 'এক মানুষ ঐশী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে', তাহলে সে ব্যক্তিটি হলেন মুহাম্মদ। কেননা, তিনি ক্ষমতাশীলদের কোনো সহযোগিতা ও কোনো ধরনের উপায়-উপকরণ ছাড়াই নেতৃত্বের লাগাম হাতে নিতে সক্ষম হয়েছেন।"

(ত) লরা ভেশিয়া ভাগলেরি :

"মুহাম্মদ ছিলেন ঐশী আদর্শ ধারণকারী ও সহনশীল ব্যক্তি। বিশেষত একত্ববাদী ধর্মের অনুসারীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। তিনি জানতেন, কীভাবে পৌত্তলিকদের সাথে ধৈর্য ও ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করে কাজ করা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন সময়ই তার উপযুক্ত কাজ করবে এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসবে। ...তিনি ভালোভাবেই জানতেন, সর্বশেষ মানুষটির অন্তরেও ঈশ্বর জায়গা করে নেবেনই।"

(থ) ফরাসি প্রাচ্যবিদ গুস্তাভ লি বোন :

"মুহাম্মদ অত্যন্ত ধৈর্য ও উদারচিত্তে নানা প্রকার নিপীড়ন ও নির্যাতন মোকাবিলা করেন।... যে কুরাইশরা দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে, তাদের সাথেও তিনি অত্যন্ত নম্র ও সহনশীল আচরণ করেছেন।"

(দ) আলফানসো দ্য লা মারটিনি :

"কার সাহস আছে মুহাম্মদের সাথে অন্য কোনো মহামানবের তুলনা করার? এসব বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ শুধুমাত্র সমরাস্ত্র, আইন ও সাম্রাজ্যই তৈরি করেছেন। অর্জনের ক্ষেত্রে তারা কিছু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক ক্ষমতাই অর্জন করেছেন, যা তাদের চোখের সামনেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে।... কিন্তু মুহাম্মদ নামের এই মানুষটি শুধুমাত্র সেনাবাহিনী, আইন, সাম্রাজা, লোকবল ও শাসকগণকেই পরিচালনা করেননি, পাশাপাশি তৎকালীন বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জনগণকে তিনি পরিচালনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি মূর্তি, দেশ দেশা, বাতিল ধর্ম,

ঋণল চিন্তাধারা ও অচল মতবিশ্বাসের বিনাশ ঘটিয়েছেন।... মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিমাণের যত মাপকাঠি আছে, এর ভিত্তিতে আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে চাই: মুহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ আছে কি?"

(ধ) টমাস কার্লাইল :

"অবিশ্বাসী ও কট্টরপন্থিরা মনে করে, মুহাম্মদ স্বীয় কর্মকাণ্ডে নিজের খ্যাতি, পদমর্যাদা ও গৌরবই কামনা করতেন। ঈশ্বরের শপথ, এটা সঠিক নয়। মরুভূমিতে বেড়ে ওঠা বিশাল চিত্তের অধিকারী দীপ্তিমান এ মহান ব্যক্তির অন্তর পরিপূর্ণ ছিল দয়া, কল্যাণ, সহানুভূতি, সততা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে। তাঁর মধ্যে ছিল না দুনিয়াবি কোনো লোভ-লালসা, ছিল না পদ-পদবি ও ক্ষমতার লিপ্সা।

আমি মুহাম্মদের মধ্যে সর্বোত্তম ও প্রশংসনীয় গুণাবলির সমাহার দেখতে পাই। তাঁর মধ্যে আমি খুঁজে পাই বিবেচনাবোধসম্পন্ন মেধা, দূরদৃষ্টি ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। তিনি চাইলে একজন শ্রেষ্ঠ কবি, মহান বীর, ক্ষমতাধর সম্রাট কিংবা যেকোনো ধারায় মহানায়ক হতে পারতেন।"

(ণ) উইলিয়াম ম্যুর :

"(মোহাম্মদ দ.-এর) গুণাবলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য– কোমলতা ও শ্রদ্ধা। তিনি তাঁর সাথীদের সাথে কোমল ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। উদারতা, বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রোথিত ছিল। আশপাশের সবার ছিল তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা। তিনি তাঁর সবচেয়ে মারাত্মক শত্রুর সাথেও মহানুভব ও উদার আচরণ করেছেন– এমনকি মক্কাবাসীদের সাথেও। অথচ এ মক্কাবাসী বছরের পর বছর ধরে তাঁর সাথে শত্রুতা করে গেছে, তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাঁর ক্ষমা ও সহনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে কর্তৃত্ব ও বিজয়ের মুহূর্তেও।"

(প) সমসাময়িক আমেরিকান বিজ্ঞানী মাইকেল হার্ট :

"মুহাম্মদকে ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বদের তালিকায় শীর্ষস্থান দেওয়াটা অনেক পাঠককে আশ্চর্যান্বিত করতে পারে; এমনকি এতে করে তাদের মনে কিছু প্রশ্নেরও উদ্রেক ঘটতে পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে

তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।”

(ফ) প্রসিদ্ধ জার্মান সাহিত্যিক গোরেথে :

“আমি পৃথিবীর ইতিহাসে একজন সুমহান আদর্শের মানুষ তালাশ করেছি। আমি সে আদর্শ পেয়েছি নবি মুহাম্মদ।”

(ব) দর্শনের ইতিহাসবিদ উইল ডুরান্ট :

“মহাপুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মানদণ্ড যদি হয় প্রভাব, তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে, ইতিহাসে মহাপুরুষদের মধ্যে মুহাম্মদ সর্বশ্রেষ্ঠ”। তিনি তাঁর গ্রন্থ *The Greatest Minds and Ideas of All Time*-এ বলেন, “...despite their political dismemberment, they are still growing in members and strength in India and chin they are making converts every hour of every day, there in no surety thet the future is not theirs.”

(ভ) স্টেনলী লেনপুল :

“মোহাম্মদ (দ.)-এর যতো সমালোচনাই করা যায়, সমস্ত সমালোচনাই তাঁর প্রশংসায় পরিণত হয়।”

এ ধরনের হাজারো প্রশংসাসূচক অভিমত সমগ্র বিশ্বের সকল স্বীকৃত মনীষীদের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) যথার্থই বলেছেন: “কোরআন সর্ব যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্মব্যবস্থা দিতে সমর্থ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্বমানবতার প্রতীক, যাহা তাঁহার বিভিন্ন হাদিস ও সুন্নত আচরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই ইসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম” (বেলায়তে মোত্লাকা : দশম পরিচ্ছেদ)। উপর্যুক্ত মনীষীবৃন্দসহ অসংখ্য সুধীজনের অভিমত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ব্যক্ত এই হক্কুল ইয়াকিন বা ধ্রুব সত্যেরই প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করে।

টীকাঃ

১. বেলায়তে মোত্‌লাকা, দশম পরিচ্ছেদ।

২. ইবিড।

৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদের ‘ক’ থেকে ‘চ’ পর্যন্ত উদ্ধৃতিগুলোর বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য– এসলামের প্রভাব ও ধর্মনীতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, খন্দকার গোলাম আহমদ, ১৩৪৮ বাংলা, কলিকাতা।

৪. দি হোলি প্রফেট, আলফ্রেড দ্যা মার্টিন, ফ্রান্স।

দ্বিতীয় পর্ব

জীবনী-সংক্ষেপ

জ্ঞান ভাণ্ডার অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

[জন্ম : ১৮৯৩ ইং, ওফাত : ১৯৮২ ইং]

প্রথম অধ্যায়

বস্তুনিষ্ঠতার আলোকে নিরীক্ষণ

“রিজা-লুল লা- তুলহীহিম তিজা- রাতু ওঁয়ালা- বাই‘উন ‘আন্ জিক্‌রিল্লাহি ওয়া ইক্বা-মিস সালা-তি ওয়া ঈতা-য়িয যাকা-তি, ইয়াখা-ফূনা ইয়াউমান্ তাতাক্বাল্লাবু ফীহিল কুলূবু ওয়াল আবসা-রু। লিয়াজ যিয়াহুমুল্লা-হু আহসানা মা-‘আমিলূ ওয়া ইয়াযী দাহুম মিন্ ফাদ্বলিহী, ওয়াল্লা-হু ইয়ারযুক্বু মাইয়াশা-উ বিগাইরি হিসা-ব”–(২৪ : ৩৭–৩৮)।

[বঙ্গানুবাদ: এমন লোক তারা (নূরের হেদায়েত প্রাপ্ত), যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র জিকির, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখেনা, আর তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেই দিন ক্বলবসমূহ ও চক্ষুগুলো উল্টে যাবে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কাজের জন্য অতি উত্তম পুরস্কার দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক প্রদান করবেন, আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন]।

জ্ঞান ভাণ্ডার অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জাহেরী-বাতেনী অবস্থান মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বহুবিধ পবিত্র মানদণ্ডের মধ্যে শুধু একটা মাত্র উপস্থাপন করা হলো। এর সাথে মহান কয়েকজন দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিকের গুরুত্বপূর্ণ বয়ানও উল্লেখ করা হলো, যার কষ্টি পাথরে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন সহজতর হয়।

এই ডিজিটাল যুগেও প্রতিনিয়ত অগণিত ক্ষেত্রে উদ্ধৃত বিশ্বনন্দিত মহান দার্শনিক-কবি-তত্ত্ববিদ মওলানা জালাল উদ্দিন রুমী তাঁর সুবিখ্যাত 'মসনবি'তে বলেন:

چیست دنیا از خدا غافل بدن ☆ نہ قماش و نقرہ و فرزند و زن

مال را کز بہر دین باشی حمول ☆ نعم مال صالح خواندش رسول

آب در کشتی ہلاک کشتی است ☆ آب اندر زیر کشتی پشتی است

"চীস্ত দুন্‌য়া আয খুদা গাফিল বুদন,

নে, কমাশ ও নুকরা ও ফরযন্দোযন,

মাল্ রা গজ্ বাহ্‌রে দীঁ বাশী হমূল,

নি' মো মালুন সালিহুন খান্দিশ রসূল।

আব্ দর্ কশ্‌তী হালাকে কশ্‌তীয়স্ত,

আব্ আন্দর যেরে কশতী পশতীয়স্ত।

বঙ্গানুবাদ:

"দুনিয়া কী? খোদা সম্পর্কে উদাসীন থাকা

সম্পত্তি, রজত কাঞ্চন ও সন্তান পরিজন নয়।

ধন-সম্পদ যদি মানব কল্যাণের জন্য তোমার কাছে রাখো,

তবে রাসূল (দ.) বলেন, ঐ সম্পদ পুণ্যের উৎস।

পানি নৌকার মধ্যে ঢুকলে তা ধ্বংসের কারণ হয়,

(কিন্তু) ঐ পানিই নৌকার নীচে তার গতির সহায়ক।"

এই কথাটাই মিঃ রেবেন লেভী তাঁর *Social Structure of Islam (Cambridge, 1951)* গ্রন্থে এভাবে বলেছেন: “Some of the Enlightened Sufies insisted that the true Saint lives among his fellowmen, Trades with them, marries and takes part in Social activities without ever forgetting God for a moment.” একমাত্র মহিয়সী তাপসী হযরত রাবেয়া বসরী (র.) ব্যতীত সকল মুসলিম সুফি, দার্শনিক, সাধক সাধিকার বাস্তব জীবনে এই সূত্রটি প্রযোজ্য। বর্তমান গ্রন্থের এই অংশে অছিয়ে গাউসুল আযম জ্ঞান-ভাণ্ডার হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উপর একটি সমীক্ষণমূলক উপস্থাপনা বিজ্ঞ পাঠক সমাজের কাছে পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে একাধারে অধ্যাত্মসাধক এবং পাশাপাশি জটিল সামাজিক আবশ্যকীয় সফল কার্যনির্বাহক হিসেবে তাঁকে অধ্যয়ন করে অনাগত সময়ের সৃজনশীল কর্মযজ্ঞের সড়ক নির্মাণ করা যায়। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বাতেনী-জাহেরী সত্তা তথা আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক অবস্থান সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভে শায়খুল আকবর-এর নিম্নবর্ণিত পর্যবেক্ষণের শরণাপন্ন হওয়াই সমীচীন প্রতীয়মান হয় :

(ক) হযরত শায়খুল আকবর মুহিউদ্দিন ইবনু আরাবী (র.) তাঁর ‘আওয়ারিফ’ গ্রন্থে বলেন, “কারামত ও খাওয়ারেক আল্লাহ্‌র দান। কখনও এই রূপ হয় যে, কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি কাশ্‌ফ ও কারামত দ্বারা সম্মানিত করেন এবং এই নিয়ামত দান করেন। কখনও কখনও এমনও হয় যে, তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি বড়ই শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু তাঁর মধ্যে কাশ্‌ফ ও কারামত কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। কেননা, কারামত একিনকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য দান করা হয়; যে ব্যক্তি খাঁটি একিন হাসিল করেছেন, তাঁর জন্য কারামতের কী দরকার?” বিজ্ঞ বিদ্বজ্জনদের মতে, কারামতগুলি ‘জিক্‌রে যাত ও ফানায়ে ক্বলব’ থেকে পৃথক জিনিষ। (হযরত মুজাদ্দিদ আল্‌ফেসানী রাহমাতুল্লাহ্‌ আলাইহি; এ এফ এম আবদুল আযিয ও সিদ্দিক আহমদ খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা বাংলাদেশ)। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবন খোলা বইয়ের মতো। চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এই মানদণ্ডের প্রিজমে তাঁর বহুমাত্রিক বর্ণালী পরিচয় অধ্যয়নে সক্ষম হবেন।

(খ) এ প্রসঙ্গে মহান দার্শনিক শিক্ষক এবং মিষ্টিক ভুবনে অদ্বিতীয় কবি মওলানা রুমীর এই বয়েতেরও উল্লেখ করে বলা যায় :

'চুঁ শোধ বর বামহায়ে আসমান,
সার্‌দ বাশাদ জুস্ত জুয়ে নরদবান।
জুজু বরায়ে ইয়ারিও তালিমে গায়েব,
সার্‌দ বাশদ রাহে খায়ের আজ বাহ্‌রে খায়ের।

বঙ্গানুবাদ : "তুমি যখন আসমানের ছাদে উঠে গেছো, তখন ছাদে উঠার জন্য সিঁড়ি খোঁজার প্রয়োজন নেই। বন্ধুত্বের খাতিরে বা অন্যদের শিক্ষার জন্য ব্যতিরেকে অভীষ্ট কল্যাণ হাসিলের জন্য ওটার তালাশের পথ খোঁজার প্রয়োজন হয় না।"

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) স্বহস্তে গড়া তাঁর অছির মর্তবা এই মসনবির এই বয়েতের আলোকে সহজে অনুধাবনযোগ্য।

(গ) এ ক্ষেত্রে মসনবির পূর্বসূরি অঙ্ক বিশারদ কবি ওমর খৈয়ামের (১০৩০–১১২৩ খ্রি.) এই রুবাইকেও কষ্টিপাথর হিসেবে ব্যবহার করা যায়ঃ

"দর্‌ জাহিরে মন নিগাহ্‌ বিসিয়ায় মকুন,
কা-আন্দরে বাতেন চুনানকে হাস্তম হাস্তম।"

বঙ্গানুবাদ : "আমার বাইরের দিকে বেশি নজর দিও না; কেন না, বাতেনীতে আমি যা আছি, তা আছি।"

[**নোট :** বাংলাদেশে একটা শাশ্বত নৈতিক প্রগতিশীল কল্যাণকামী সমাজের বীজতলা বিস্তারের অন্যতম অধ্যাত্ম পুরোগামী দার্শনিক গ্রন্থকার, মিস্টিক-সামাজিক সংগঠক হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সামগ্রিক অবস্থান প্রক্ষেপণের উদ্দেশ্যে উপর্যুক্ত তিন বিশ্ববিশ্রুত মনীষীর বাণীর আলোকবর্তিকা পেশ করা হলো। বক্ষমাণ পুস্তকের এই আকিঞ্চন লেখকের নিজস্ব কোন অবলম্বন কার্যকরভাবে অনুপস্থিত। শুধু বলা যায়, মাইজভাণ্ডারী গতিশীল বেলায়তের এই মহান দার্শনিককে দেখেছি, পড়েছি, অনুধাবনের চেষ্টা করেছি এবং ক্রমঃসম্প্রসারশীল চিন্তার সমৃদ্ধে ভেসে গিয়েছি – লেখক।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. জাহেরী পৃথিবীতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী এক দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী পদাতিক : রুহানী জগতে নিভৃতচারী :

"A man without any contemporary progressive socio-political outlook is intellectually blind and incomplete" – কোন সামাজিক মানুষের সমীক্ষণবাদী মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে অনুসৃত এই সূত্রের ধরা-ছোঁয়ার বহুযোজন দূরে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অবস্থান। জীবনের রূঢ় বাস্তবতা তাঁর জন্য বরাদ্দ করেছিল স্ব-নির্মিত, স্ব-শিক্ষিত, স্ব-পরিশুদ্ধ একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবার উন্মুক্ত ময়দান। তাঁর জীবনের কর্ম-পর্যায়ের সূচনা থেকে জীবনাবসান পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর পার্থিব সকল কাজ ও পদক্ষেপ তথা পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা জনসেবামুখী কর্মসূচি, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক, আধ্যাত্মিক তথা বাতেনী, এমনকি তাঁর সৃজনশীল জ্ঞানগর্ভ লেখকসত্তা বিনির্মাণের দুরূহ সাধনাও ছিল সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী। তাঁর সংগ্রাম বহুল কর্মজীবনের আলেখ্য এই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি জীবন থেকে পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন কিম্বা ধূলি-কর্দমময় বাস্তবতাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার কিম্বা মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ দান 'সীমিত পার্থিব জীবনকালকে' উপেক্ষা করার বা অপাঙক্তেয় হিসেবে এড়িয়ে যাবার মানসিক পক্ষাঘাতে প্রভাবিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাটির পৃথিবীতে জীবনবাদী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি লালনকারী এক দৃঢ়চিত্ত পদাতিক এবং একই সাথে রুহানী জগতে নিভৃতচারী।

নবিজীর (দ.) শরিয়ত ও মারিফাত সত্তাকে পথের দিশা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি তাঁর কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রগুলোতে বিশ্বস্ত উম্মত বা অনুসারীরূপে বিংশ শতাব্দীতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন চারপাশের সকলের জন্য। তাঁর মাঝে একাধারে একজন পবিত্র, সৎ, ধর্মাচারী, তাসাওউফের ভাষায় জাহেরী-বাতেনী উভয় ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিশালী একজন সমাজ-সচেতন সংস্কারক, লোক-কল্যাণকামী এবং একই সাথে একজন অস্তিত্ববাদী (Existentialist) দার্শনিকের সমন্বয় ঘটেছে।

২. জন্ম ও শিক্ষা জীবন :

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জন্ম ২৭ শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ ইং মোতাবেক ১৩ ফাল্গুন, ১২৯৯ বাংলা। তাঁর পিতা হযরত সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (১৮৬৫–১৯০২ ইং) এবং দাদা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) (১৮২৬–১৯০৬ ইং)। মাত্র নয় বছর বয়সে (১৯০২) তিনি তাঁর পিতাকে, তেরো বছর বয়সে (১৯০৬) দাদাকে হারিয়ে বলতে গেলে 'ইয়াতিম' অবস্থায় উপনীত হন এবং জীবিত দাদিজানের রক্ষণে বড় হতে থাকেন।

মহতী দাদীজানের ওফাতের পর তাঁর কৈশোর কাটে তদীয় ফুফু (হযরত সাহেব কেবলার একমাত্র কন্যা) সৈয়দা আনোয়ারুন্নেসার স্নেহ ছায়ায়। তাঁর বোন সবরুন্নেসাও একই বুকের দুর্গে বড়ো হন। হযরত সাহেব কেবলা (ক.) নাতিকে ডাকতেন "দেলা ময়না" এবং স্বীয় কন্যাকে ডাকতেন "তোতা ময়না" নামে। লক্ষ্যণীয় যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ময়না পাখির মতো তাঁদের পবিত্র জবানেই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বাণী ও উপদেশ যথাসময়ে যথাস্থানে পরিবেশিত হয়েছে।[১] তাঁর মহতী ফুফুর ব্যবস্থাপনায় গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দ্বিতীয়া কন্যা শাহজাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুনের সাথে তাঁর শাদীয়ে মোবারক সম্পন্ন হয় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৩ বছর বয়সে। তিনি পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যার জনক।

ইতোপূর্বে পাঁচ বছর বয়সে শিক্ষার হাতে খড়ি হয় তাঁর দাদাজানের হাতে। এ সময়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাবুনগর (ফটিকছড়ি থানা) নিবাসী মওলানা অলি উল্লাহ্ প্রথম এবং হাটহাজারী থানার মির্জাপুর নিবাসী মওলানা হাফেজ ক্বারী তফাজ্জল

হোসেন তাঁর দ্বিতীয় গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। শেষোক্ত জনের উপযুক্ত শিক্ষায় তিনি তাসাওউফ ও বাস্তব জীবনের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে 'তফাজ্জল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই মহান নিষ্ঠাবান শিক্ষকের কাছে তিনি আরবী, বাংলা, ফার্সি, উর্দু ভাষা এবং কোরআন হাদিসের মৌলিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসায় (বর্তমান হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ)।

৩. হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মাধ্যমে উদ্গাত (Sprouted) মাইজভাণ্ডারী বেলায়তি ধারার পবিত্র ঐতিহ্যের ক্রমঃসম্প্রসারমান বিবর্তনশীলতার সমকালীন (আমাদের বর্তমান সময় একবিংশ শতাব্দীও এই দাওরা বা কালের অন্তর্গত) ও চলমান বিকাশ। ওলী-আল্লাহ্‌দের নিরবচ্ছিন্ন ধারার প্রবহমানতার বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাঁরা নিজ নিজ স্থান-কাল-পরিবেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আত্মস্থ করে গরিষ্ঠ সংখ্যক সাধারণ মানুষের সাংসারিক, পার্থিব উন্নতি ও শান্তির পাশাপাশি রূহানী বা আত্মিক জ্ঞান ও উপলব্ধির অচঞ্চল প্রশান্তি অর্জনের কার্যকর নির্দেশনা দিচ্ছেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জাগতিক ও চিন্ময় বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলে এ বিষয়টা খোলাসা হয়ে যায়। তিনি সমানভাবে সমকালীন জাগতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভারসাম্যমূলক অবস্থানের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি রূহানী উন্নয়নের ক্ষেত্রে তালিম দিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের শিক্ষা ও নির্দেশনা স্ব-কালের সীমা পেরিয়েও কার্যকর থাকে।

অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর পিতামহের এই শিক্ষাকে প্রণালীবদ্ধ করার দুরূহ কাজটি আধুনিকতার মানদণ্ডসম্মতভাবেই সম্পন্ন করেছেন। এই কাজের যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন যুগপৎ একাডেমিক ও রূহানীভাবে। তাঁর দাদা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছাত্র হিসেবে যেমন মেধাবী ছিলেন, তেমনি শিক্ষক হিসেবেও ছিলেন প্রসিদ্ধ ও সর্বস্বীকৃত। অতএব, পিতৃহারা পৌত্রের শিক্ষার 'বিস্‌মিল্লাহ্' মহান দাদার হাত দিয়েই শুরু হবে, তা প্রকৃতি-

নির্ধারিত। অতঃপর তিনি তাঁর যুগপৎ গৃহ শিক্ষক ও খালু হাফেজ মওলানা সৈয়দ তফাজ্জল হোসেনের নিকট আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা এবং পবিত্র কোরআন শিক্ষা লাভ করেন আনুষ্ঠানিকভাবে। এরপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয় তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম শহরের মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসায়, যেখানে ইতোপূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন একাধারে তাঁর পিতৃব্য, শ্বশুর ও পীরে তাফায়ুজ হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)। অধ্যাত্ম পরিমণ্ডলের রেওয়াজ অনুসারে তিনি তাঁর দাদাজানের নির্দেশে কুত্‌বুল ইরশাদ হযরত মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারীর (ক.) নিকট বায়াতে-সুন্নাত গ্রহণ করেন। হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ইন্তিকালের পর তাঁর দাদাজান তাঁকে পুনঃবায়াত করান। মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসায় তিনি সেখানকার সিলেবাস অনুযায়ী কোরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস, মানতিক, ফিকাহ্, উসুল প্রভৃতি সফলভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা সকলকে মুগ্ধ করে। তাঁর দাদাজানের ওফাতের পরও এই মাদ্‌রাসায় তাঁর অধ্যয়ন অব্যাহত থাকে। **১৯১১** সনে এই মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে 'আহম' [আসাম] শাসনামলের একটি তাম্রমুদ্রা মাদ্‌রাসা পাহাড়ের মাটিতে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়, যা তিনি চন্দনপুরাস্থ দারোগাবাড়ির মৌলভী আবদুস সালাম বি.এ সাহেবের মারফত চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের পালি ভাষার প্রফেসরের নিকট পাঠিয়ে দেন। প্রফেসর সাহেব তা কোলকাতা যাদুঘরে পাঠিয়ে দেন, যা এখনো সেখানে প্রাচীন মুদ্রার স্মারক-সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত আছে। তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, বিশাল দূরদৃষ্টি ও প্রবল জ্ঞানস্পৃহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে নিহিত। মওলানা রুমির 'মসনবি শরিফ', ইবনে আরাবীর বিখ্যাত 'ফুসুসুল হিকম', ইমাম গাজ্জালীর কিমিয়ায়ে সাআদাত, ইহ্‌ইয়াউ উলুমিদ্দিন, খৈয়াম, সাদী, দার্শনিক ইকবাল প্রমুখের অমর অজর গ্রন্থ ভুবনে তাঁর পরিব্রাজন ছিল আটপৌরে অভ্যাসের মতো। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ছিল তাঁর নিত্যসাথী। এখানে আমরা তাঁর বাস্তব বা জাহেরী শিক্ষা ও চর্চা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবহিত হলাম। এছাড়া মৌলিক জ্ঞানের ফল্গুধারার সাথে তাঁর যোগাযোগ তো তাঁর মহান দাদাজানের মাধ্যমেই ঘটে। এটা সর্বস্বীকৃত যে, কোন বিষয় পাঠ করার পাশাপাশি তার গভীরে প্রবেশ করা এবং তা আত্মস্থ করে সামনের পানে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা জন্মসূত্রেই

মানুষের মেধা-মননে নিহিত থাকে, যা জাহেরী ব্যবহারিক শিক্ষায় শাণিত হয়। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) দৃশ্যমানভাবে এই মহতী মেধা-মনন-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অনুধাবন-পর্যবেক্ষণ শেষে সঙ্গত উপসংহারে উপনীত হবার দক্ষতার অধিকারী ছিলেন।

অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে তাঁর দাদাজান ছিলেন বড় জোর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এই সুবাদে সমাজের অনুচ্চতর, অন্ত্যজ সামাজিক বর্গের লোকেদের সাথে নৈকট্য বেশি ছিল তাঁর। তদুপরি যে মহান আধ্যাত্মিক বৈভব তিনি অর্জন করেছিলেন, সে বৈভব বিতরণের মুখ্য ক্ষেত্র ছিল এসব মানুষেরই সমাজ ও বর্গ– যা নবিদের ইতিহাসেও লক্ষ্যণীয়। সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত, সহায়-সম্বলহীন, উপেক্ষিত মানুষরাই ছিলেন নবিদের "বিনামূল্যে, বিনিময়-প্রত্যাশা মুক্ত" কল্যাণকর্ম ও ধারণার বীজ বপনের উর্বর ক্ষেত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হযরত আকদসের জীবৎকালে বাংলার গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের সমাজ-সংসার ক্ষেত্রেও ইতিহাসের এই ধারার কার্যকারিতা দৃশ্যমান। অতএব, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কর্মজীবনের মিশনের সুবিন্যস্ত, সহজবোধ্য উপস্থাপন ও প্রয়োগপূর্বক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার গুরুদায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবে অছিয়ে গাউসুল আযমের উপর অর্পিত হয়েছিল। তিনি প্রাকৃতিকভাবে, রূহানীভাবে তাঁর মহান পূর্বতন পুরুষ, শিক্ষক, পালক ও দিশারীর দ্বারা সেভাবেই যে নির্মিত হয়েছিলেন, তা দিবালোকের মতো সত্য।

আরবী শব্দ 'দ্বীন' এবং সংস্কৃত শব্দ 'ধর্ম'-এর ৩৪টিরও বেশি প্রতিশব্দ ও অর্থ আছে। এসব অর্থ মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি সকল প্রকার কর্ম-প্রবাহকে বেষ্টন করে থাকে। বৃক্ষজগৎ, প্রাণীজগৎ, বস্তুজগৎ, নক্ষত্রলোকের বিভিন্ন অবস্থা, অবস্থান ও বিবর্তন প্রভৃতি বহু বিষয় বুঝাতে আরবি ও বাংলায় সাধারণত এই দুটো শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে অবশ্য জীব, বৃক্ষ ও পদার্থের বিভিন্ন অবস্থান্তর বুঝাতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন Custom, Manner, Behavior প্রভৃতি। কিন্তু, ইসলামী কিম্বা সংস্কৃত ঐতিহ্যে 'ধর্ম' শব্দের ব্যঞ্জনা কেবল আচার-অনুষ্ঠান কিম্বা Ritual এর মধ্যে সীমিত নয়। মাইজভাণ্ডারী জীবনবোধ বা ত্বরিকা 'ধর্ম'কে এই বৃহত্তর অর্থেই গ্রহণ করে এবং তা হযরত আকদাসের জীবদ্দশাতেই ব্যাপক

প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কেবল মুসলিম সমাজ নয়; নিপীড়িত, বঞ্চিত অন্যান্য লোকসমাজও এই মহীরুহের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে এগিয়ে আসেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর এই ঐহিক ও পারত্রিক (জিসমানী ও রূহানী) কর্ম-প্রক্রিয়ার যুগোপযোগী পরিমার্জন, প্রসারণ ও উন্নততর বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া সূচিত হয়। অচিরেই তাঁর জন্মস্থান ও বাসস্থান মাইজভাণ্ডার গ্রামটি, অতীতের যুগ প্রবর্তক ওলী আল্লাহ্দের নিবাসস্থলের মতোই সর্বস্তরের কল্যাণকামী গণমানুষের মিলনস্থল তথা ধর্মীয় পরিভাষায় তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এ অবস্থায় রোজকার এই মহান স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণকামী লোকসভার জন্য স্বীকৃত রেওয়াজ অনুযায়ী সর্ববৈষয়িক বহুমাত্রিক প্রকরণ প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়ে। কারণ, কল্যাণার্থী মানুষরা অনুসরণীয় কোন প্রকার রূপরেখার অবর্তমানে নিজ নিজ মনোমত আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি পালন করতে থাকেন, যাতে সামগ্রিক গড় সমন্বয়, শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থাপনার অভাব ছিল। তদুপরি এই মহান আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মানুষের শৈক্ষিক, নৈতিক জীবনাচার, সাংস্কৃতিক অনুশীলন ও রুহানী উন্নয়ন চর্চার প্রশিক্ষণ-আগার হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠায় জীবন-সংশ্লিষ্ট সর্ববিষয়ে পদ্ধতিকরণ বা Methodization অপরিহার্য হয়ে উঠে। উল্লেখ্য, হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মুহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.), গরীবে নেওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্তী (র.), হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দ (র.) প্রমুখের দরবারে সমসাময়িকতার সাথে সঙ্গতি রেখে আচার-অনুষ্ঠানের প্রকরণ করা হয়েছিল, যেগুলোর অনেক কিছু এখনো সেসব স্থানে প্রচলিত আছে। এমনকি খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, উপজাতীয় সমাজের ধর্মীয় ভরকেন্দ্রগুলোতেও নির্ধারিত বিধিবদ্ধতা প্রবর্তিত আছে।

বিদ্বান ও বিজ্ঞ অছিয়ে গাউসুল আযমের আলোকিত আধুনিক মানস এই পদ্ধতিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করেন এবং নিজের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বশক্তি দিয়ে এই দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬০-এর দশকে তাঁর পরিণত ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বয়সে রচিত ও প্রকাশিত "বেলায়তে মোত্লাকা"-মাইজভাণ্ডারী প্রকরণের আকরগ্রন্থ–এই লক্ষ্য এবং সাধনারই ফলশ্রুতি। প্রথম সংস্করণের মলাটে এই পুস্তকের নাম মুদ্রিত ছিল এভাবে :

“বেলায়তে মোত্‌লাকা
অথবা মাইজভাণ্ডারী
মুক্ত সুফিবাদ”

এই গ্রন্থটিকে বাংলায় ‘সর্বজনীন রূহানী নৈকট্য প্রক্রিয়া’ রূপে অভিহিত করা যায়। এই গ্রন্থে মানুষের জৈবিক, পার্থিব, অপার্থিব, সাংস্কৃতিক, কাঙ্ক্ষিত প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-আচার-সংস্কৃতিগত পার্থক্য নির্বিশেষে কাঙ্ক্ষিত সর্বমানবিক কল্যাণমুখী ঐক্যবিধানের প্রয়াসের নির্দেশনার সন্ধান পাওয়া যায়; যা চিন্তা ও কর্মের জগতে নতুন নতুন ফসলী ক্ষেত্রের পত্তন ঘটাতে সক্ষম। এই গ্রন্থ মূলত একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সম্পন্ন দার্শনিক, সমাজ-বিজ্ঞান ও মৌলিক অধ্যাত্মচর্চার পরামর্শমূলক গ্রন্থ; নিরেট কোন ধর্মীয় কিম্বা ধর্মাচার বিষয়ক পুস্তক নয়। বরং বলা যায়, বাস্তব কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে মারিফাত অর্জনের সূত্রবিশিষ্ট পথ-নির্দেশক গ্রন্থ।

৪. রাজনৈতিক জীবন :

১৯১৮ সালে কিছু সময় তিনি খেলাফত আন্দোলনের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকেন। মওলানা মোহাম্মদ আলী ঐ সময়ে সংঘাত বিক্ষুব্ধ, বহু জাতি ও ধর্মে বিভক্ত ভারতবাসী ও ভারত-ভূমিকে অভিন্ন নৈতিক সূত্রে আবদ্ধ এবং একই সমতলে স্থাপন করার জন্য ‘ফেডারেশন অব ফেইথ’ তত্ত্ব পেশ করেন আল-কোরআনের শিক্ষা ও মদিনা সনদে বিধৃত সর্বমানবিক দর্শনের ভিত্তিতে। যা তাঁর ভাষায়, “Here in this country of hundreds of millions of human beings, intensely attached to religion and yet infinitely split up into communities, sects and denominations. Providence has created for us the mission of solving a unique problem and working out a new synthesis, a Federation of Faiths.”

মুসলিম সমাজের দুর্দশা ও ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ্যে অজ্ঞতা তাঁকে ব্যথিত করে তোলে, যা তাঁর একই গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে। এ সময়ে তিনি ১৯২১–২২ ইং সনে দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, পণ্ডিচেরী, হুগলী, কলিকাতা, বার্মা প্রভৃতি স্থান ও অঞ্চল সফর করেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

৫. সমাজসেবা, শিক্ষা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম

বলা যায়, অছিয়ে গাউসুল আযম জন্মগতভাবেই সমাজ ও রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং তেমন একজন মানুষ হিসেবে, প্রত্যক্ষ উপকারমুখী মানুষ হিসেবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, যা একজন দায়িত্বশীল মুসলিমের শরিয়তী কর্তব্যও বটে। ১৯১৬ সনেই তিনি মাইজভাণ্ডারের অজ পাড়াগাঁয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'আহমদিয়া জুনিয়র মাদ্‌রাসা, যা বর্তমানে চাড়ালিয়াহাটে স্থানান্তরিত হয়ে হাই স্কুলে পরিণত হয়েছে। তিনি ১৯৪৩ সনে 'তফাজ্জল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী', দারুত্ত্বালিম প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান পিপাসুদের রসদ যোগানোর ব্যবস্থা করেন। এরপর ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া প্রাইমারী স্কুল'। এছাড়া আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী নামে একটি সামাজিক সংগঠন তৈরী করেন, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজ থেকে অনাচার দূর করে সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি ও সংহতি মজবুত করা। এই সংগঠনের আদর্শ, লক্ষ্য ও দর্শন দার্শনিক আল্লামা আজাদ সুবহানীর পরিকল্পিত 'রব্বানী সংঘের' অনুরূপ।

১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক-ঈমানী বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যা এখনো আধ্যাত্মিক ঘরানাগুলোর সমাজসেবামূলক কর্তব্যের স্মারক হয়ে আছে। এর পাশাপাশি স্থানীয় কৃষি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, কৃষি উন্নয়ন সমিতি গঠন, সড়ক ও যোগাযোগ উন্নয়ন প্রভৃতিতে সক্রিয় অবদান রেখে একজন প্রকৃত আধুনিক ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তির যথার্থ স্বরূপের দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়ে আছেন। বাংলা ভাষা আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতি সমর্থন, ১৯৫০ এর দশকে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, ১৯৬০ এর দশকে স্বাধিকার এবং এরপর সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক তথা সর্বপ্রকার সক্রিয় সমর্থন দিয়ে নিজেকে একজন পূর্ণাঙ্গ বাস্তববাদী শরিয়তী মানুষ হিসেবে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটান, যাতে নবিজী (দ.) এবং খোলাফায়ে রাশেদার জীবনধর্মী সৃজনশীল ভূমিকার প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর রচিত ১২টি (বারো) পুস্তক তাঁর শৈক্ষিক, দার্শনিক প্রজ্ঞা, ধর্মীয় চেতনার গভীরে সফল অবগাহনের সাক্ষ্য বহন করছে।

তাঁর অনন্য কীর্তি হলো, 'প্রকৃত সুন্নী সিলসিলায় নবিজী (দ.), খোলাফায়ে রাশেদা এবং মহান দার্শনিক সমাজবিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিচার-সাম্য, সামাজিক সম্প্রীতির লক্ষ্যাভিসারী তৌহিদে আদ্‌ইয়ান, জনকল্যাণ, মারিফাত চর্চা প্রভৃতি সব কিছুকে একটি বাস্তবতামুখী ফ্রেমে স্থাপন করে ইসলামের শাশ্বত সর্বজনগ্রাহ্য প্রকল্প আধুনিক বাঙালি প্রজন্মের কাছে পেশ করা।' যা 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' শিরোনামে সিলমোহরাঙ্কিত।

একটি যুগোপযোগী ধর্মীয় আবহে জন্ম ও বেড়ে উঠার ফলে তিনি বিজ্ঞান চেতনাসমৃদ্ধ সমাজের মূল্যবোধ, আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিকতাকে সৃজনশীলভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৈদেশিক ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সক্রিয় প্রতিবাদী। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের শিক্ষা পদ্ধতিতে হাজার বছরের বিজ্ঞান-দর্শন-সংস্কৃতিপুষ্ট মানবতাবাদী শিক্ষার প্রতি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের উপেক্ষা, তাঁকে এবং তাঁর দাদাজান হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে কী মাত্রায় পীড়িত করেছিল, তার বিবরণ বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

৬. তফাজ্জল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী এবং আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী প্রসঙ্গ[২] :

তফাজ্জল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী :

"আমার ওস্তাদ গৃহ শিক্ষক মওলানা হাফেজ ক্বারী মোহাদ্দেছ জনাব তফাজ্জল হোসাইন মির্জাপুরী (র.) সাহেব, হযরত কেবলার রওজা শরীফের খেদমত হইতে অবসর হওয়ার পর বাড়ি মোকামে যাওয়ার পূর্বে আমাকে স্নেহ করিয়া বলিয়াছিলেন; 'দেখ, যেই সময় তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার লোক থাকিবে না সেই সময়ের জন্য নেক্কার বুজুর্গ সঙ্গী হিসাবে এই কেতাবগুলি দিয়া যাইতেছি। আশাকরি তোমার ভাল সহায়ক হইবে। সেইজন্য এই কেতাবগুলি জমা করিয়াছি। তাই তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে এই মূল্যবান তাছাওফ সুফি জ্ঞান সম্পন্ন, হাদীস, তফসীর, ফেকাহ, লোগাত বা শব্দকোষ উর্দু, ফার্সী, আরবী বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মণীষীগণের রচিত সাহিত্য ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর সমন্বয়ে "তফাজ্জল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী" নামে তাঁহার

স্মৃতিজড়িত এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করি। ১। বর্ণ শিক্ষা ২। মৌখিক চর্চা ৩। পরিচিতি জ্ঞান বা ধর্ম দর্শন ৪। বিধি ব্যবস্থা ৫। সুফি মতবাদ প্রচার- যাহা ইসলামী সভ্যতার সারতত্ত্ব, এই পাঁচ প্রকার শিক্ষামালার প্রচলন করিতে মনস্থ করি। যেহেতু আমার ধারণা, এই স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষা দ্বারা যাহা অর্জিত হয় তাহাতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। প্রকৃতপক্ষে লাইব্রেরী শিক্ষাই ফলপ্রসু জ্ঞান দানে সক্ষম।”

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী গঠন :

“উপরোক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে মাঠের উত্তর পার্শ্বে আমার মালিকী জমির উপর দক্ষিণমুখী বারান্দাযুক্ত চৌচালা ফুশের ছাউনিযুক্ত একখানা ঘর নির্মাণ করিয়া “দারুত্ত্বালীম” নাম দিই। এই ঘরখানাই ১৯৩৮ইং সনের জানুয়ারি মাসে বাংলা মাঘ মাসের আট তারিখে বিধ্বস্ত হইলে ১৯৪৯ইং সনে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী নামে একখানা সংস্থার প্রতিষ্ঠাক্রমে উপরোক্ত উদ্দেশ্য ফলপ্রসু করার মানসে পুনরায় যত্নবান হই। ১৯৬৯ইং সালে সংগঠনমূলক “গঠনতন্ত্র” ছাপাইয়া প্রচার করি। এই উদ্দেশ্যে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুস্তক ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে খোদার ফজলে সক্ষম হই। জনগণের চাহিদার অনুপাতে “মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছর” এবং ‘মীলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া’ দুই দফা, “বেলায়তে মোতলাকা” গ্রন্থটি তিন দফা ছাপাইতে বাধ্য হইয়াছি। “মোসলেম আচার ধর্ম” পুস্তকটি শাখা আঞ্জুমান পাঠাগারে সমাদর লাভ করিতেছে। “বিশ্বমানবতায় বেলায়তের স্বরূপ” বাহির হইয়াছে। এতদছাড়া বাহরুল উলুম মাওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী “আয়নায়ে বারী” উর্দু ভাষায় এবং মৌলানা ফয়েজ উল্লাহ্ (গোল্ড মেডেলিস্ট কলিকাতা আলীয়া) লিখিত (অনুলিখনে) বাংলা ভাষায় জীবনী ও কেরামত ইত্যাদি গ্রন্থ ছাপাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছি। এই শেষোক্ত হযরতের জীবনীটিও দুই দফা ছাপাইতে হইয়াছে।”

৭. ওহী তথা কোরআন-হাদিসের খেদমতে:

দর্শনের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, খ্রিষ্টীয় নবম শতকে মুতাজিলা চিন্তাবিদরা যুক্তিকে (Reasons) ওহীর (Revelation) ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে যুক্তিকে জ্ঞানের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করতেন এবং তৎকালীন শাসক আল-মামুন এই দর্শন

চিন্তাকে সরকারি অধ্যাদেশ বলে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণীয় করার পদক্ষেপ নিলে হিতে বিপরীত হয়; যার ফলে বিজ্ঞান ও যুক্তির বিরুদ্ধে এক ধর্মান্ধ শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। নবি সাহাবা হযরত আবু মুসা আল-আশআরীর অধস্তন বংশধর আবু হাসান আল-আশআরী প্রথমে ছিলেন তৎকালীন মুতাজিলা চিন্তাগোষ্ঠীর [যা পরবর্তী উন্নততর দার্শনিক সমীক্ষণে অসম্পূর্ণতাকীর্ণ হিসেবে বিবেচিত] শেষ শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ আল-জুব্বাইয়ের প্রতিভাবান ছাত্র। দর্শন জগতে তখন যুক্তি ও ওহীর মধ্যে কোনটা যথার্থ জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিতে পারে, তা নিয়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় চলছিল। আল-মামুনের হুকুম-আইন এ সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। কারণ, মন ও হৃদয়, বিবেক ও চিন্তার উপর কোন প্রকার দুনিয়াবী আইন বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারে না। এ বিষয়টা গভীরভাবে আলোড়িত করে আবুল হাসান আল আশআরীকে এবং সমাধানসূত্র পাবার উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় শিক্ষকের সাথে যুক্তি-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুক্তি-পাল্টাযুক্তির এক পর্যায়ে দার্শনিক আল-জুব্বাই স্বীয় ছাত্রের প্রশ্নের সামনে নিরুত্তর হয়ে পড়েন। সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে আবুল হাসান আল আশআরী স্বীয় শিক্ষকের পথ থেকে সরে আসেন এবং প্রখর যুক্তিমত্তার সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'শুধু যুক্তি বলে মানব জীবনের 'সকল' সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না, এ ব্যাপারে ওহীর উপর নির্ভর করতে হয়'। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিনি এবং তার অপর দুই সহযোগী আত্ তাহাবী (মিশর), আল-মাতুরুদী (সমরকন্দ) 'যুক্তিকে' 'ওহীর' অধীন বলে দার্শনিকভাবে সাব্যস্ত ও উপস্থাপন করে সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন লাভে সমর্থ হন এবং একই সাথে 'যুক্তি ও বিজ্ঞান' বিরোধীদের ভ্রান্তি অপনোদনে সক্ষম হন। আল-আশআরীর দার্শনিক সমর্থকরা ইতিহাসে আশআরীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ইতিহাসে আরো বর্ণিত আছে যে, মানসিক এই প্রবল দ্বন্দ্বকালে আল আশআরী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর নিত্য অনুসৃত দর্শন চর্চা, ওজীফা-আচারাদি থেকেও বিরত থাকতে মনস্থ করেন। ঐ সময়ে একদিন ২৭ রমযান রাতে সকল আচার বাদ দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লে স্বপ্নে নবিজীর (দ.) প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি দার্শনিক চিন্তা পরিত্যাগ করে শুধু কুরআন-হাদিস পাঠ ও আলোচনা করছি'। নবিজী (দ.) বলেন: "আমি আপনাকে দর্শন চর্চা পরিত্যাগ করতে বলিনি। বলেছিলাম, আমার হাদিস সমর্থন করতে। কেননা, এগুলো যথার্থ।" একই রমযান মাসের প্রথম দশকে

নবিজী (দ.) তাঁকে স্বপ্নে পরামর্শ দেন : “আমার হাদিস সমর্থন করুন। কারণ, এগুলো সত্য।” দ্বিতীয় দশকেও একইভাবে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে নবিজী (দ.) তাঁকে বললেন, “আমি আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তার কি করলেন?” আশআরী বললেন, “হুজুর! আমি সনদ পরীক্ষা করে হাদিস গ্রহণ করি এবং এসব হাদিসকে যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকি” (অবরোহ পদ্ধতি)। তাঁর জবাব শোনার পর নবিজী (দ.) আবার বললেন, “আমার হাদিসমূহকে সমর্থন করুন। কেননা, এগুলো যথার্থ।” দ্বিতীয় দফা স্বপ্নাদেশের পর তিনি দার্শনিক চিন্তাধারা একেবারে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলে তৃতীয় দফা স্বপ্নে নবিজী (দ.) তাঁকে সঠিক পথের দিশা দেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এরপর থেকে আল-আশআরী যুক্তি-বুদ্ধিমত্তার উপরে নবিজীর (দ.) হাদিস, ওহীকে প্রাধান্য দিতে থাকেন এবং প্রত্যেক হাদিস ও ওহীর সমর্থনে অচিন্ত্যপূর্ব শাণিত যুক্তি তাঁর জবানে মওজুদ হতে থাকে। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর কাছে অতীব শ্রদ্ধাভাজন এই দার্শনিক আল–আশআরী উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ ও প্রয়োগপূর্বক যুক্তিভিত্তিক দর্শনকে ওহীর সাথে জুড়ে দিয়ে দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে অসীম এক গগনের সৃষ্টি করেছেন, যা এখন পর্যন্ত সর্বত্র গ্রহণীয় ও সম্প্রসারণশীল এবং এই সত্যেরই সুস্পষ্ট সংকেত দিচ্ছে যে, ওহী তথা কুরআন হাদিসের যথার্থতা সপ্রমাণে ব্রতী হলে প্রকৃত সত্য বা হক্কুল ইয়াকিনের সন্ধান মিলে। এরপর হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) আশআরীয় মতবাদের সাথে তাসাওউফ সংযুক্ত করে এই তত্ত্বকে দর্শনের সর্বোচ্চ আসনে সংস্থাপন করেন।

আবুল হাসান আশআরীর এই বৃত্তান্ত এখানে পরিবেশন করার উদ্দেশ্য হলো এই যে, অছিয়ে গাউসুল আযম সমকালে বিরাজমান বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্তির কুয়াশাজাল ছিন্ন করে সম্পূর্ণ আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন-হাদিসকে উপস্থাপন করেছেন বিশ্বমানবিক প্রেক্ষাপটে। তাঁর আরো বিশালত্ব হলো, যে সূক্ষ্ম ও জটিল কাজটা সাধনের দায়িত্ব ছিল বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের, সে কাজটাই তিনি হাতে নিয়েছিলেন গতানুগতিক পন্থায় ধর্ম কিম্বা ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য নয়; জ্ঞান, দর্শনের ভুবনকে প্রকৃত সম্পদে সম্পদশালী করে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে। বেলায়তে মোত্‌লাকাসহ তাঁর গ্রন্থরাজি সেই সাক্ষ্য ধারণ করে আছে।

অছিয়ে গাউসুল আযমের দৃষ্টিঙ্গিতে একটি জিনিস ধরা পড়েছে যে– যে-কোন ধর্মীয় আচার-সংস্কৃতি– তা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উপজাতি, প্রকৃতিপূজক যা-ই হোক না কেন– সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠার পেছনে একটি আর্থ-সামাজিক বাস্তব পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে; সংশ্লিষ্ট ধর্মাচারের প্রকৃতি, নৈতিক-ব্যবহারিক স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য যা বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ প্রয়োজন। এই সামাজিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যথার্থভাবে অনুসরণ করেছিলেন হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) এবং সমাজ বিজ্ঞানের জন্মদাতা ইবনে খালদুন। বেলায়তে মোত্লাকার দার্শনিক কাঠামো বিনির্মাণ করতে গিয়ে অছিয়ে গাউসুল আযম সমকালীন সমাজের প্যানোরামাও বিশ্লেষণ করেছেন, যার স্বাক্ষর 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে বিধৃত। এ বিষয়টা আমাদের বাংলাদেশের ধর্মাচার-সংস্কৃতির উদ্ভবের বাস্তব সামাজিক কারণ নির্ণয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এতে সমাজের দীনতা, প্রত্যাশা ও সম্ভাব্য সমাধানসূত্র নির্ণয় করার পথ সুগম হয়।

৮. মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আচার-আচরণ বিধি (যা হযরত আকদাস কর্তৃক প্রবর্তিত হয়, তা) লিখিত পুস্তিকা আকারে সুবিন্যস্ত করে রেখে তিনি যেমন এক গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন, তেমনি ত্বরিকা ও বেলায়তের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আচার-সংক্রান্ত এসব পুস্তিকা: মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার, মুসলিম আচার ধর্ম, মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া। এসব পুস্তক পড়ে যে কোন ব্যক্তি ত্বরিকার আচার সংক্রান্ত সম্যক জ্ঞান অর্জন করে এস্তেমাল করতে সক্ষম।

তাঁর জীবন-কর্ম-কীর্তি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এতে কেবল ত্বরিকতপন্থীদের জন্য নয়, সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনগণ তথা আরো বৃহত্তর পরিসরে সর্বমানবিক কল্যাণের দিগন্ত প্রসারিত হবে। রূহানী ফুল বক্ষে ধারণ করে যারা জাহেরী জগতে সুগন্ধ বিলান, তাঁরাই পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানব।[৩]

টীকা :

১. হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) মাইজভাণ্ডারীর তোতা ময়না: রফিক আনোয়ার, ২০০৮ ইং, আবীর প্রকাশন, চট্টগ্রাম।

২. এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক।

৩. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাই মাইজভাণ্ডারী (একটি সমীক্ষনবাদী উপস্থাপনা), আলোকধারা বুক্স, গাউসিয়া হক মন্জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ২০২০ইং।

তৃতীয় অধ্যায়

তদীয় সাজ্জাদানশীন মনোনয়ন

অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত যে, তিনি মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচন, প্রচার-প্রসার, সর্বোপরি শরাফত সংরক্ষণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পেরেছিলেন একনিষ্ঠভাবে। তিনি প্রায় শতায়ু হয়েছিলেন (১৮৯৩–১৯৮২)। এর মধ্যে অর্ধ শতাব্দী কালেরও অধিক সময় ধরে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে গিয়েছেন দু'হাতে। জীবন সায়াহ্নে এসেও তিনি ছিলেন খুবই পরিকল্পিত এবং একনিষ্ঠ। তাঁর পর মাইজভাণ্ডারী দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে তিনি যে সময়োপযোগী সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

প্রথম পুত্র শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সব সময় প্রচণ্ড গতিশীল মজ্‌যুব হালে থাকতেন বলে তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে স্বকীয়ভাবে বসতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যা "গাউসিয়া হক মন্‌জিল" নামে সুপরিচিত। তাঁর একমাত্র সন্তান শাহ্‌জাদা হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম. জি. আ.) বর্তমানে এই মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন। দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ মুনিরুল হক সবিনয়ে এ গুরু দায়িত্ব থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা পোষণ করলে তৃতীয় পুত্র সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে তিনি তাঁর সাজ্জাদানশীন মনোনীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতদপ্রসঙ্গে ১৯৭৫ সালে অছি-এ-গাউসুল আযম কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 'জরুরি বিজ্ঞপ্তি' শীর্ষক লিফলেটে দরবারে পাক পরিচালনা পদ্ধতির রূপরেখা অঙ্কন করে যান। চতুর্থ পুত্র ডা. সৈয়দ দিদারুল হক (জন্ম : ১৯৪৫) নায়েব মোন্তাজেম, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল। কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ সহিদুল হক (জন্ম : ১৯৫১) নায়েব মোন্তাজেম, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল।

বংশ লতিকা

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) (১৮২৬–১৯০৬)

↓

শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারী (রঃ) (১৮৬৫–১৯০২)

↓

শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রঃ) (১৮৯৩–১৯৮২)

৫ পুত্র ↓	৬ কন্যা ↓
(১) সৈয়দ জিয়াউল হক (১৯২৮–১৯৮৮)	(১) সৈয়দা মোবাশ্বেরা বেগম
(২) সৈয়দ মুনিরুল হক (১৯৩২)	(২) সৈয়দা মুনিরা বেগম
(৩) সৈয়দ এমদাদুল হক (১৯৩৬)	(৩) সৈয়দা নাজিরা বেগম
(৪) সৈয়দ দিদারুল হক (১৯৪৫)	(৪) সৈয়দা রিজিয়া বেগম
(৫) সৈয়দ সহিদুল হক (১৯৫১)	(৫) সৈয়দা কামরুননেসা
	(৬) সৈয়দা নাজমুন নেসা

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রথম পুত্র শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৯২৮-১৯৮৮) প্রায় প্রতিনিয়ত অলৌকিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর জীবদ্দশায় রীতিমতো কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। ৬০ বছর বয়সে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন ।

১৯৬৯ সালে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর যে গঠনতন্ত্র মুদ্রিত হয়েছিলো তাঁর পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অছি-এ-গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী নিজ হস্তে রচনা ও গ্রন্থনা করেছিলেন। তাঁর হস্তলিপি পাণ্ডুলিপিটির একটির ছায়ালিপি এখানে সন্নিবেশিত হল :

এই আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজ ভাণ্ডারী
নিম্ন ভাবে- গঠিত- হইবে।

১- দায়েরা কমিটি-

এই দায়েরা জোন- বা এলাকার ১০ জন ব্যক্তি- যুগ্ম-ভাবে- ভক্ত গন লইয়া গঠিত- হইবে। যথা-

(ক)- সাধারন মেম্বার- এবং বিশেষ মেম্বার- সমন্বিত হইবে- এই জনগনের মধ্য হইতে- বিশেষ মেম্বার শ্রেণির (১০) দশ জনে লইয়া- দায়েরা কার্য্যকরি কমিটি গঠিত- হইতে পারিবে। প্রত্যেক দায়েরা- এলাকার জনসাধারণ হইতে [illegible] [illegible]- লোক- [illegible]- মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ "[illegible]"- [illegible] [illegible] গঠিত- হইবে। এই মেম্বার [illegible] দাবী [illegible] হইবে। [illegible] [illegible]- [illegible] জনে [illegible]- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

২। জিলা- সদর- কমিটি-

(ক) এই- সদর জিলা জোন- বা এলাকার ব্যক্তি- ভক্ত গন লইয়া- এই জিলা- সদর- কমিটি- গঠিত হইতে পারিবে। এবং [illegible]- [illegible] ইত্যাদি- এবং [illegible] ইত্যাদি- দপ্তর- মোতাবেক- থাকিতে হইবে।

৩। কেন্দ্রীয় কমিটি-

[illegible]- এই কেন্দ্রীয় কমিটিতে- ১। [illegible]- [illegible] [illegible] [illegible]- ১। [illegible]- [illegible] [illegible] [illegible] নামনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৩। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]- [illegible] [illegible]- এলাকার [illegible] [illegible] এবং বিশেষ মেম্বার [illegible]- [illegible] [illegible] মেম্বার- এবং জিলা- সদর কমিটির [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] জন- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গঠিত হইবে।

[আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী চট্টগ্রাম-এর প্রকাশনা বিভাগের (পরিচ্ছদ) প্রধান নিয়ন্ত্রক সৈয়দ সহিদুল হক প্রকাশিত 'মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী' গ্রন্থের সৌজন্যে]

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র "প্রত্যাশা"

জীবনের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন সফলভাবে পাড়ি দিয়ে অছিয়ে গাউসুল আযম সিদ্ধান্ত নিলেন, আর নয় এবার দায়িত্ব হস্তান্তরের পালা। হযরতের অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক সম্পদ সন্তানদের দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়ার পালা। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তিনি স্থাবর সম্পত্তিসমূহ একটি দলিলে সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন এবং সেই দলিলেই সন্তানদের ১২/০৩/৬৪ তারিখে ঘোষণা করে দিলেন, **"........সমুদয় কাজ কারবার পরিচালনা, সংরক্ষণ, হেফাজত ও এন্তেজামের ভার তোমাদের উপর অর্পন করিয়াছি........"**

উক্ত বক্তব্যটি স্বব্যাখ্যাত এবং বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার তাঁর পাঁচপুত্রই সংরক্ষণ করেন। প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, এই দায়িত্বের মধ্যে মাযার শরীফের জমিনের ও পুকুরের অংশের অধিকার এবং খেদমতের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত।

তারপর ১০/০৮/৬৪ তারিখে অছিয়ে গাউসুল আযম নতুন পরিস্থিতিতে হযরত আকদাসের মাযার শরিফের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে 'অছিয়তনামা' নামক একটি ব্যবস্থাপনা পত্র প্রণয়ন করেন। এই অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা পত্রে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে তিনি তাঁর চারপুত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর অছিয়তনামা সম্পাদনের ১ বছর, ০৫ মাস, ১৩তম দিনে হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র মহান উরস শরিফের পূর্ব দিন ০৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী ১৯৬৬ ইংরেজী হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র হুজরা শরীফে বসে, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র খয়েরী রংয়ের চাদরখানা নিজ হাতে ছেলে তথা শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) গায়ে পরিয়ে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে **'খেলাফত ও আমানত'** অর্পণ করেন।

শাহজাদা সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-কে ১৯৭৪ সালে ১৪ই জুলাই বৃহস্পতিবার বাগান বাড়িতে (বর্তমান গাউসিয়া হক মন্‌জিল) প্রেরণের ০২ মাস, ২৭তম দিনে অর্থাৎ অছিয়ত নামা সম্পাদনের ১০ বছর, ০২ মাস, ১ম দিনে

শাহজাদা সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (ম.)-কেও খেলাফত প্রদান করেন।

অছিয়ে গাউসুল আযম তদীয় বড়পুত্র শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর অনন্য ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়ে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের বর্ধিতাংশ হিসেবে গাউসিয়া হক মন্‌জিল প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেন এবং তথা হতে হযরত আকদাসের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বতন্ত্র স্বাধীন অবস্থান অনুমোদন করেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁরই অনুমোদনের অনুবলে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে ১০ই মাঘ, ২৩ই জৈষ্ঠ্য, ১০ই পৌষসহ দরবারের সমস্ত অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এখনও পর্যন্ত গাউসিয়া হক মন্‌জিলের পক্ষ হতে হুযুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র আদর্শ এবং ত্বরিকতের নীতিমালায় অবস্থান করে যে অনন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক খেদমত সম্পন্ন হয়েছে তা সর্বজনবিদিত এবং বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

অছিয়তনামার তৃতীয় পৃষ্ঠায় আছে– "বর্তমানে আমার বার্ধক্য অবস্থা, আমি নানাবিধ দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। তাই তোমরা গ্রহিতাগণ আমার পুত্র এবং স্থলাভিষিক্ত ওয়ারিশান বিধায় আমার উপরোক্ত কার্য্যাদি সুচারুরূপে এন্তেজাম করার ভার তোমাদের উপর অর্পন করিলাম, তোমরা আমার স্থলে স্থলাভিষিক্ত হইয়া সম্মিলিতভাবে উক্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির পরিচালন, শাসন, সংরক্ষণ, হেফাজত, পরিবর্তন, পরিবর্ধন প্রভৃতি যাবতীয় কার্যাবলি আমার ছিলছিলা ও রীতিমত পূর্ববৎ অক্ষুন্ন রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন ও পরিচালনা করিতে থাকিবা। উক্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদির খেদমত কার্য্যাদি আঞ্জাম দিবার জন্য খাদেম নিযুক্ত করিতে পারিবা এবং খাদেমানের ভরণ পোষণ নিজ তহবিল হইতে আদায় করিবা, হযরত কেবলা কাবার রওজা শরীফ ও তৎসংলগ্ন মৌরশী কবর স্থানের পবিত্রতা রক্ষা করিবা, হানীজনক কোন কার্য্য না করিবা এবং আমার শাবেক নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে রওজা শরিফের তেল বাতি আতর গোলাব ইং প্রয়োজন অনুসারে নিজ তহবিল হইতে ব্যয় করিবা এবং উপরোক্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদীর যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে থাকিবা।"

চতুর্থ অধ্যায়

একজন সুফি জীবন-যোদ্ধার দিনলিপি

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর জীবন ও কর্মকালীন বিংশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক হালচালের সামান্য আঁচড়

১. বিংশ শতকের জটিল শিল্পোৎপাদন, বিপণন, যান্ত্রিক উপকরণ নির্মাণ, ব্যবহার, শ্রমঘন পণ্য বাজারজাতকরণ, পুঁজি সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিশ্ব মানব সমাজের চলিষ্ণু জীবন ধারায় নবতর পরিবর্তন আনে। ঔপনিবেশিক দখল-শোষণ-পীড়নের নতুন অধ্যায় শুরু হয় পৃথিবীর বুকে, যা নানারূপে এখনো অব্যাহত। গাড়ুতিক নিয়মেই এ ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয় শ্রমদাস প্রথা। মানুষের জীবিকা ও বাঁচার মৌলিক অধিকারের মানচিত্রে নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি। হিমালয়ান উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশেও এই প্লাবনের আবির্ভাব ঘটে অপ্রতিরোধ্যভাবে। এ পরিস্থিতিতে 'মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে দেবার' নতুন পন্থায় উদ্ভাবনের সাধনায় নিমগ্ন হন ইসলামের মূল নীতির ঝাণ্ডা বরদার মুসলিম লোক সমাজের অগ্রবর্তী অংশ। বিংশ শতকের প্রথম সিকিতেই এই নবতর বাস্তবতার সাথে পরিচিত হন অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী।

১৯২০-এর দশকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের অন্যতম অধ্যায় ছিল কংগ্রেস-খিলাফত আন্দোলন। সময়ের স্রোতে ভেসে স্বাভাবিকভাবেই তিনি আসেন এর সংশ্রবে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়কর পরিণতির বেদনা যে তাঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল, তার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'জীবনী ও কেরামত' এবং 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে।

২. ইতিহাসের ধুসর অতীতের আসমানের আলোয় :

আল-কোরআন এবং অনুসন্ধানী ঐতিহাসিক, সমাজ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের পরীক্ষিত অভিজ্ঞতালব্ধ লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায় যে, হযরত আদম (আ.) এবং মা হাওয়া (আ.) কৃষি কাজ তথা জমি কর্ষণ, পানি সিঞ্চন, বীজ বপন, শস্য আহরণপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে প্রাপ্ত সকল প্রকার বিবরণী, তথ্য-উপাত্ত নির্ভর সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয়। আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে : "লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি কাবাদ (৯০ : ৪) অর্থাৎ আমি মানুষকে কষ্ট-ক্লেশ বিজড়িত শ্রমর্নিভর করে সৃষ্টি করেছি।" মানুষ প্রাণী জগতের অন্যতম সদস্য। তবে, তার বিশেষত্ব এই যে, তার মস্তিষ্ক সৃজনশীল, চিন্তা ও বিচার শক্তিসম্পন্ন হবার বদৌলতে সে Rational অহরসধষ দূরদর্শী বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী হিসেবে নিজেকে অভিহিত করে এবং প্রাণী জগত ও বস্তুজগতের অন্যান্য সদস্যদের উপর কর্তৃত্ব করে, যা আল-কোরআনের একাধিক আয়াতে উল্লেখ করা আছে।

মানব সমাজ ও সভ্যতার প্রগতিশীল ক্রমবিকাশের যে পরিচ্ছন্ন সারাৎসারমূলক বিবরণ আল-কোরআনে ব্যক্ত করা আছে, তাতে দেখা যায় যে, হযরত আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.)-এর কৃষি কাজ সহযোগে যে সমাজ বিকাশের শুরু, তা ধাপে ধাপে উন্নীত হতে থাকে। হযরত ইদ্রিস (আ.)-গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিঃবিজ্ঞান, কলমের সাহায্যে লিখন, সেলাইকর্ম, আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র তৈরি, ওজন-পরিমাপ, গণনা পদ্ধতি প্রচলন করেন। এর পূর্বে লোকেরা জীবজন্তু এবং তারও পূর্ববর্তীরা পাতা-প্রশাখা দিয়ে আব্রু সৃষ্টি করতেন। ব্যাবিলন ও পরবর্তীকালে মিশর ছিল তাঁর সুবিশাল কর্মক্ষেত্র। তৎকালে ঐ সব এলাকায় প্রচলিত ৫২টি (বাহান্ন) ভাষায় তিনি কথা বলতে জানতেন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাঁদেরই ভাষায় নসিহত বা দাওয়াত দিতেন। তিনি দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, যন্ত্রপাতির নক্শা তৈরি, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণাগার, মসজিদ নির্মাণ, দু'শতাধিক শহর আবাদ, তাঁর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে চারভাগে ভাগ করে (১) ইলা ওয়াস (২) যুস (৩) ইসফিলিবুশ (৪) যুস আমুন নামে চারজন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তাঁর আংটিতে অঙ্কিত ছিল : 'আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান সহকারে ধৈর্যধারণ বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়।'

৩. সামাজিক দৃষ্টিকোণে প্রত্যেক নবি-রাসুল তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ :

মানব সমাজের প্রগতিশীল বিবর্তন অব্যাহত থাকে, যার জ্যামিতিক ছক উপপাদ্য-সম্পাদ্যসমেত আল-কোরআনে পরিদৃষ্ট হয়। তবে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, আল-কোরআনে উল্লেখিত প্রত্যেক নবি-রাসুলের উদ্ভব একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ থেকে। প্রবল প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করে করেই তাঁদের উত্থান। এক অর্থে হযরত মুহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত সকল নবি রাসুলই উম্মি, তাঁদের অবস্থান ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। তাঁরা ছিলেন উম্মি মানুষদের সুখ-দুঃখের সাথী। সাধারণ মানুষরাই ছিলেন তাঁদের ভিত্তি এবং তাঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষদের আশ্রয় স্থল ও নিরাপত্তার সম্বল। এর মধ্যে হযরত দাউদকে (আ.) তৎকালীন রেওয়াজ অনুযায়ী বিভিন্ন কঠিন প্রক্রিয়াজাত করে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। তবে তাঁকে আল্লাহ্ একেবারে সূচনাতেই কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দেন যে, তিনি যেন কোন অবস্থাতেই তাঁর খেয়াল-খুশি মতো কোন কাজ না করেন (৩৮ : ২৬)। তাঁর পুত্র হযরত সোলায়মানকে (আ.) সূক্ষ্ম ন্যায়বিচারের ক্ষমতা এবং সমকালে বিস্ময়কর নির্মাণ প্রকৌশলের জ্ঞানদান করা হয়েছিল। হযরত নূহ্‌কে (আ.) জাহাজ নির্মাণ শিল্প, হযরত ইব্রাহিমকে (আ.) যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান দেওয়া হয় এবং এই জ্ঞানবলে তিনি তৎকালীন পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বৈরশাসক নমরুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। হযরত মুসা (আ.) রুখে দাঁড়ান নির্মম ফেরাউনী দাসপ্রথার বিরুদ্ধে, যা ছিল সমকালীন অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। ফেরাউনের দেহাবশেষ এখনো মমি আকারে রক্ষিত আছে মানব জাতির শিক্ষার উপকরণ রূপে। হযরত মুসা (আ.) লাভ করেন ঐশী গ্রন্থ তাওরাত। তাঁর পর জাগতিক অর্থনীতিতে মুদ্রাব্যবসা (সুদে অর্থ ঋণ প্রথা) চালু হয়। তৎকালীন সিনাগগে অর্থাৎ ইহুদী উপাসনালয়ে একশ্রেণির যাজক এ ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েন, যার উল্লেখ আল-কোরআনেও রয়েছে। কালস্রোতে হযরত ঈসার (আ.) আবির্ভাব ঘটে একেবারে মৃত্তিকাবিহীন 'বস্তু' থেকে। তিনি সিনাগগে সূদী ব্যবসায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং অর্থদানকারীদের চেয়ার-টেবিল ছুঁড়ে ফেলে দেন (মার্ক: ইঞ্জিল শরিফ ১১-১৬ ইতোপূর্বে) অনিয়ন্ত্রিত আর্থিক, দৈহিক ভোগবাদিতা এবং এর ভয়ঙ্কর কুফল সম্পর্কে হযরত লুত (আ.)-এর উম্মত এবং সাদ-আদ প্রভৃতি কওমের পরিণতি থেকে সতর্কতামূলক তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন নবি-রাসুলের জীবন সংগ্রাম মূলত তৃণমূল পর্যায়ে সৎ

জীবন, শান্তিপূর্ণ, সুন্দর পরিবেশ সৃজন ও স্থিতিশীল কল্যাণময়তা কায়েমেরই সংগ্রাম।

আখেরী নবি হযরত মুহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত এসে রিসালত-নবুয়তের ধারার অবসান ঘটান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন এবং দার্শনিক কবি ড. মুহাম্মদ ইকবালের মূল্যায়নে নশ্বর এই জগতের শাশ্বত আধুনিকতার ধারার সূত্রপাত ঘটে তাঁকেই কেন্দ্র করে। এরপর ধারাবাহিকভাবে মহান ওলী-আল্লাহ্দের আবির্ভাবের পর্যায় শুরু হয়েছে। তাঁদেরকে দেখা যায়, মানুষের প্রাকৃতিক মৌলিক অধিকার হরণকারী নরপতি, রাজা-বাদশাহদের অন্যায়মূলক স্বৈরতান্ত্রিক জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তি (র.), খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (র.) প্রমুখদের এই ভূমিকা ঐতিহাসিক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ আমলে ধর্মীয় ন্যায়-শিক্ষার আলো সম্বল করে বাংলা-ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রতিরোধ সংগ্রামের উদ্ভব ঘটেছে; অনেক ইংরেজ তথা সামন্তবাদী দেশি-বিদেশি কলমবাজ তাদের সুবিধা ও খুশিমতো এসব সংগ্রামকে কালিমালিপ্ত করে মুছে দিতে চেষ্টা করেছে, যা সম্ভব হয়নি।

৪. অছিয়ে গাউসুল আযম কর্তৃক নবি-জীবন চর্চা :

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) অতি নিবিড়ভাবে নবি-জীবন (দ.) চর্চা করেছেন বিশ্ববিখ্যাত মহান মনীষীদের নির্মিত মানদণ্ডে; অবশ্য নবিজীকে (দ.) পরিমাপ করার কিম্বা অনুধাবনের সূত্রাবলির শেষ কোথায়, তা নিয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং হবেও না। কারণ, তিনি একেবারে সহজ ভাষায় আমাদের এই পৃথিবীর জীবন-সমাজসমেত অন্তহীন মহাজগতের এক বিভাময় হলোগ্রাম। এই বিস্ময়কর হলোগ্রামকে মসীলিপ্ত করার বদ মতলবে বিশেষ করে ইউরোপের একশ্রেণির পাদ্রী, অপর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন ঐতিহাসিক, কোরআনকে মানব রচিত প্রমাণের জন্য একশ্রেণির কথিত ধর্ম-ইতিহাসবেত্তার পাগলামী, একেবারে কাল্পনিক মিথ্যা রচনাকারী বাস্তবতা বিবর্জিত হুক্কা-হুক্কায় বিবেকবান মানুষের কানে তালা লাগার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে স্থিতিবান সৃজনশীল সততা কিম্বা সত্য ও সততার প্রাকৃতিক অবস্থান এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বলভাবেই প্রমাণিত। ইউরোপ তথা পশ্চিমা বিশ্বেই এমন সব সত্যনিষ্ঠ

নৈর্ব্যক্তিক দর্শন ও ইতিহাসবেত্তার আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের একটা মাত্র ফুৎকারেই মতলবী বানোয়াটী বিভ্রান্তির মাকড়সার জাল বিলীন হয়ে গেছে। এমনকি হিমালয়ান উপমহাদেশেও এন্তার ধর্মগতভাবে অমুসলিমও নবিজীর (দ.) প্রদীপ্ত সূর্যালোক থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করার অপপ্রয়াসী কৃত্রিম কল্পমেঘমালা সরিয়ে নিতে কলম ধরেছেন। এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) আলোকিত বিংশ শতাব্দীর বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট মানুষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তুর্কী সালতানাতের পতন এবং পশ্চিমা ঔপনিবেশিক সমরযন্ত্র ও অর্থশক্তির ঝড়ের মুখে মৃত সুলতানী শাসনাধীন মুসলিম খনিজ ও কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের ভাগ-বন্টনের নিষ্ঠুর-অমানবিক দিক তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে বেদনার্তরূপে প্রতিভাত হতে থাকে। ব্রিটিশ, ফরাসী এবং তাদের তৎকালীন সহযোগীরা তুর্কী সাম্রাজ্যের পূর্ব ইউরোপ এবং আফ্রিকাকে জ্যামিতির খাতায় চতুর্ভূজ, পঞ্চভূজ প্রভৃতি অঙ্কন করার মতো এঁকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। ‘বলকান স্টেটস্’ নামে পরিচিত ঐ অঞ্চলের ভাগাভাগি ইতিহাসে ‘বলকানাইজেশন’ (Balkanization) নামে পরিচিত। এখনো আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ সেই সরল জ্যামিতিক বিভাজন রেখা ডিঙ্গাতে পারেনি। কথিত কৃত্রিম জাতীয়তাবাদ, যা ইটালীয় রেনেসাঁজাত ইউরোপীয় যন্ত্রশিল্প বিপ্লবের হায়াত বাড়ানোর জন্য কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট এসব অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন অজুহাতে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ-সংঘাত সৃষ্টি করেছে, যার জের এখন আরো ভয়ংকররূপে বিশ্বব্যাপি চেপে আছে এবং এই বিভাজনের সুযোগ বৃহৎ শক্তিবর্গ অস্ত্র নির্মাণ ব্যবসায়ের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আল-কোরআনের একাধিক আয়াতে অন্যায় হত্যা ও পীড়নের উদ্দেশ্যে অস্ত্র নির্মাণ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তখন থেকে আজকের ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাপি বিভিন্ন দেশ ও ভাষাভাষি মহান মানব-প্রেমিক বিজ্ঞানী-দার্শনিকরা অস্ত্র নির্মাণের বিরোধিতা করে আসছেন এবং অনেকে বিভিন্নভাবে নির্যাতিতও হয়েছেন। আল-কোরআনে একাধিক আয়াতে (১৬ : ৯৩, ১৮ : ২৭, ৩০ : ২২) বিশ্বময় মানবজাতির বিভিন্ন বর্ণ, ভাষা, জীবিকা বৈচিত্র, আবাসনের বিভিন্নতার উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ, সত্যবান, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, কল্যাণকারী ও ফ্যাসাদকারী প্রভৃতি কর্ম পরীক্ষার কাজেও

আল্লাহ্ এই বিভাজনকে ব্যবহার করেন। তবে সর্বত্র একটি কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সবাই তাঁর সৃষ্টি, তিনি সবার মধ্যে জন্মসূত্রেই ভালো-মন্দের বোধ স্থাপন করেছেন, যার প্রয়োগের ব্যাপারে মানুষের সীমিতভাবে ইচ্ছাশক্তিবান এবং ভালো-মন্দ সব দায় তাদের নিজেরই। যুগের পর যুগ এই মানবিক সমাজের বিবর্তনের পর হযরত মুহাম্মদ (দ.) মদিনা সংবিধানে পার্থিব ক্ষেত্রে শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ অবস্থানের এক সনদ রচনা করেন তৎকালীন সব নাগরিকের সম্মতিতে, আনুগত্যে ও বিশ্বাসে। এতে যা প্রতিফলিত, তাকে বিজ্ঞজনরা 'রবুবিয়াত' (বাংলায় পালনবাদ) বলে অভিহিত করে মহান রাব্বুল আলামিনের সর্বব্যাপি নিরবচ্ছিন্ন রহমত ও রহিমত্বের স্নিগ্ধ ধারার বহমানতা বলে বর্ণনা করেন। ঐ সনদে আছে নিজস্ব গণতান্ত্রিক অভিমত প্রকাশ, বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান, উপকরণ, অবলম্বন পাবার অঙ্গীকার, শোষণ-পীড়ন ঘৃণা প্রভৃতি বর্জনের প্রত্যাশাবাদ। এই মদিনা সনদ ও রাষ্ট্র কোনক্রমেই ধর্মাচার-প্রতিবন্ধী ছিলনা, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কোন ফাঁক-ফোকর এখানে ছিল না। এজন্য বিংশ শতাব্দীর বহু বাংলাভাষি দর্শনবেত্তা এটাকে প্রকৃত সমতাবাদী, জাগতিক শান্তিবাদী রাষ্ট্রের নমুনা বলে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ধর্মাচার ব্যবসার এখানে নাক গলাবার সুযোগ ছিল না। ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুক্ষেত্র বৃদ্ধির সাধনা। হযরত আদমের (আ.) সময়ের রেখাচিত্র অঙ্কনে আল-কোরআনে বলা হয়েছে "শুরুতে মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল (২ : ২১৩, ১০ : ১৯) বিজ্ঞ সমাজ-দর্শনবেত্তাগণ এই সূত্রকেই তৌহিদী সমতাতন্ত্র কিম্বা তৌহিদী সাম্যবাদ নামে অভিহিত করেন। পরবর্তীতে নফ্সানিয়াত, ভোগবাদ, ক্ষমতাবাদ প্রভৃতির দৌরাত্মে সাম্য-সমাজ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে। আবির্ভাব ঘটে নমরুদ, ফেরাউন প্রমুখের মতো সাম্রাজ্যবাদীর। ধ্বংসকারী তথাকথিত 'বীর-বিজয়ীদের, 'দিগ্বিজয়ী'; মানবতার ক্ষেত্রে যাদের বিন্দুমাত্র ইতিবাচক অবদান নেই। প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, উৎকট ধনতন্ত্র, দানবিক সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি রকমারী শোষণ-পীড়নবাদ; যার বিরুদ্ধে লড়ে দেশে দেশে অগণিত সত্যকামী মানবতাবাদী সংগ্রামী আত্মাহুতি দিয়েছেন। আল-কোরআন সপ্তম খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম সিকিতেই এসব অন্যায়-পীড়ন-শোষণকে হারাম ঘোষণা করে। সাদামাটা ভাষায় বলা হয়েছেঃ "তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না" (২ : ২৭৯)। অন্যায়কারীর প্রাপ্য সম্পর্কেও খুব সহজ ভাষায় বলা

হয়েছে : “দুষ্কর্ম করতে থাকলে তাদের প্রতি দণ্ডাদেশ ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায়, তখনই আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি” (১৭ : ১৬)।

৫. অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বিকাশের প্রেক্ষাপট :

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) জন্মগতভাবে, পারিবারিকভাবে, পরিবেশগতভাবে, শিক্ষাগতভাবে, আচরণগতভাবে এই শিক্ষা-মানস ও চেতনায় বিকশিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর মহান জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) শিক্ষা ও তালিম থেকে তিনি গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতাবাদ, ধনবৈষম্য বিরোধিতাবাদ, শোষণ-পীড়ন বিরোধিতাবাদ, ধর্মাচারব্যবসাবাদ প্রভৃতি সুচয়ন করে একটা আদর্শ কল্যাণমূলক পালনবাদী সমাজ, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য পালনবাদী বিশ্বাস, নির্মাণের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি নিয়ে ‘কর্ষণ’ বা চাষে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

আল-কোরআনের বয়ান মতে মানব সমাজ ও সভ্যতার জ্ঞান সূচনায় আদিম সাম্যবাদ বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে গোত্র-প্রথা, সমাজ প্রথা প্রভৃতি গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার প্রয়োজনে। সমকালে সমাজে চলন ও পরিচালনার জন্য কতো রকম রীতি নিয়ম-কানুনের উদ্ভব হয়, পরিবর্তন ঘটে, তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। সামাজিক বিবর্তনের একপর্যায়ে সামষ্টিক স্বেচ্ছাকর্মমূলে সর্বজনীন জীবিকা সংস্থান বা পালনপ্রথার স্থলে কর্তৃত্ব প্রথা, দাস প্রথা, সামন্ত কৃষি প্রথা, যন্ত্র বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎপাদন প্রথা, ব্যবসা-মুনাফার ধারণা ও ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক সম্পদ ও নিয়ন্ত্রণশক্তি অর্জনের রেওয়াজ শুরু হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিশেষ করে ইউরোপে বাণিজ্যভিত্তিক সম্পদ আহরণ, কথিত কৃত্রিম জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ, জাতির কল্যাণের নামে অন্যদেরকে সংঘবদ্ধভাবে জোরপূর্বক শোষণ পীড়নের জমানা শুরু হয়, যার জের এই একবিংশ শতকেও নগ্নভাবে দৃষ্ট হচ্ছে। অর্থনীতির অতীত পর্যায় অর্থাৎ দাস-সামন্ত-কৃষি-পুঁজিবাদী-উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী এবং এসবের প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ হিসেবে আধুনিক সমাজতন্ত্র/সাম্যবাদী অর্থনীতি ও সামাজিক বিন্যাসের কাজ শুরু হয়। কিন্তু হতাশার বিষয় এই যে, মানুষের অন্তর্জাত চিন্তা, ভোগ ও ক্ষমতালিপ্সা প্রভৃতি কারণে নবসৃজিত এই সমাজবিন্যাস হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ও পড়ে। একেবারে

সর্বসাম্প্রতিক কথিত 'উন্নত জগৎ' জাপান-কোরিয়া থেকে শুরু করে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি 'অর্থশক্তির' প্রথম কাতারের সদস্যদের কোটি কোটি শিক্ষিত তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীর দৃশ্যত প্রচুর আর্থিক রোজগার সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যয়-বাহুল্য, আবাসন সঙ্কটের কারণে নিজেরা সুস্থ প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম হচ্ছেন না। পবিত্র দাম্পত্য জীবন রেখা দূরে সরে যাচ্ছে, হাজার বছর পূর্বেকার পৃথিবীর সমাজের মতো। বিকৃত জীবন, 'দিনগত পাপ ক্ষয়' আর চরম হতাশা প্রত্যেকের ভিতরটা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। অনেক অমূল্য জীবন পর্যবসিত হচ্ছে ব্যর্থতা, বঞ্চনা, হতাশায় হনন প্রক্রিয়ায় ডুবে সব ঋণলে থেকে পৃথিবী থেকে সটকে পড়তে চান অনেকেই। কিন্তু না! মানব জীবন এতো মূল্যহীন খড়খুটো নয়। এই বিকৃতি, ধস, পতন ঠেকিয়ে আলোর পথেই সবাইকে উঠিয়ে দিতে হবে। তাই উৎকণ্ঠিত বিশ্ববিবেক নতুন আদর্শিক অবলম্বন চান এবং তা হলো, সমগ্র পৃথিবী-মানবজাতিকে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সমগ্র বস্তুগত সৃষ্টিকে একক ইউনিট হিসেবে গণ্য করে সবার বাঁচার, টিকে থাকার অর্থাৎ পালনবাদী শান্তিবাদী পার্থিব সমাজ নির্মাণের ধারণা দানা বাঁধছে। এর কিঞ্চিৎ আলোকমাত্র 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে দৃশ্যমান।

৬. নবিজীর (দ.) ইসলামের এক ঝলক :

আল-কোরআন তথা নবিজী হযরত মুহাম্মদের (দ.) ইসলাম যে মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভেদ, স্বৈরতন্ত্র, ভোগবাদী পুঁজিতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সমর্থন করে না, তার সুস্পষ্ট নির্দেশন বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কোরআনে তথা নবিজীর (দ.) জাগতিক দর্শন ও কর্ম কৌশলের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে দর্শন শাস্ত্রের বিশ্ববরেণ্য শিক্ষক ড. খলিফা আবদুল হাকিম বলেন যে, তাঁর অবিনশ্বর সামাজিক কীর্তি; (ক) কল্পিত মিথলোজিক্যাল গড্‌ বা দেব দেবীর ভীতি থেকে মানুষকে মুক্তিদান, (খ) প্রাকৃতিক ও নৈতিক আইন লংঘন না করা, বরং এর অনুবর্তী হয়ে চলা, (গ) অত্যাচারী শাসকরাই মানুষের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় হন্তা বিধায় গণতান্ত্রিকভাবে উপযুক্ত শাসক নির্বাচন করা, (ঘ) সিজারের পাওনা সিজারকে দাও, আর গডের পাওনা গডকে দাও–এই রীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত পোষণ করে নবিজী (দ.) বলেন, কোন সিজারের অস্তিত্ব থাকাও অনুচিত (সহীহ্‌ বুখারী), (ঙ) প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষই এতিম ও মিসকিন– তাই রাষ্ট্র তথা সরকারকে এতিমের সম্পত্তির অভিভাবকের

মতো আচরণ করতে হবে, (চ) যে কোন মানদণ্ডে সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা, (ছ) যাজকতন্ত্র বা ধর্মাচার ব্যবসার হাত থেকে উম্মি মানুষকে মুক্তি দেওয়া তথা স্বার্থ লেশহীনভাবে মানবজাতি তথা সৃষ্ট জগতের কল্যাণ ও বিকাশে ব্রতী হওয়া (বিস্তারিত বিবরণের জন্য ড. খলিফা আবদুল হাকিমের বিখ্যাত গ্রন্থ Islamic Ideology আলোচনাযোগ্য)।

৭. বর্তমান মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর অভ্যন্তরে :

পরিতাপের বিষয়, বর্তমান মুসলিম অধ্যুষিত অধিকাংশ অঞ্চলে মদিনা সাধারণতন্ত্রের আলোয় আলোকিত কোন রাষ্ট্র বা প্রশাসন দৃশ্যমান নয়। সাম্রাজ্যবাদী শোষক পুঁজিপতি শিল্প চেইন চক্রের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতারা এখনো আল-কোরআনে ও ইসলামের দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান মূলনীতিকে তাদের অপকর্মের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করে নানামুখী অপপ্রচারে লিপ্ত থাকছেন। আরো হতাশা ও দুঃখের বিষয়, অর্থ-অস্ত্রের দাপটে জাতিসংঘের মতো বিশ্ব সংস্থার মঞ্চকেও এই অবাঞ্ছিত দুষ্কর্মে অপব্যবহার করা হচ্ছে। অবশ্য প্রত্যেক এ্যাকশনের বিপরীত রি-এ্যাকশনের পদার্থ বিজ্ঞানসম্মত সূত্র অনুসারে একাধিক ইতিবাচক দিকও আছে। অনুন্নত আপাতত বিশৃঙ্খল মুসলিম অধ্যুষিত জাহানসহ বিশ্বের অপরাপর অঞ্চলের বিবেকবান চিত্ত অস্ত্র ও অর্থবাজদের অস্থিরতার হেতু জানতে দিনে দিনে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এই গেড়োর ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠছেন এবং উৎকটভাবে প্রকটিত অন্যায়ের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ ও প্রকাশ করছেন।

মুসলিম জাহানে রাজতন্ত্র, আমীরতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেঁকে বসে আছে। বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত অর্ধ ডজনের মতো অস্ত্র-শক্তিমন্ত, রাষ্ট্রের শাসকরা তাদের আভ্যন্তরীণ পুঁজি ও বাণিজ্যের পোষকতা করতে গিয়ে অন্যান্য অনেক এলাকার মতো মুসলিম অঞ্চলগুলোকেও চুষে খাচ্ছে, পিষে মারছে। রাজতন্ত্র, শোষণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ধারণাবিরোধী মদিনা সাধারণতন্ত্রের আবির্ভাব ঠেকাতে হেন কোন অপকর্ম নেই, তারা করছে না। অথচ ঐসব দেশেই ক্ষমতায়, অস্ত্র ব্যবসা, পুঁজি ব্যবসায়ীর প্রতিভুরা অগণিত উম্মি জনতার প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণের জন্য কোন কাজ করছে না। তারা ‘মারণাস্ত্র’ বানায়, ‘জীবনোপকরণ’ ধ্বংস করে। মানুষ মারে। অথচ আল-

কোরআন তথা ইসলামের পার্থিব জীবন দর্শন এর সম্পূর্ণ বিপেরীত; যা সর্বদা সৃজনধর্মী, কোন ক্রমেই ধ্বংস কিম্বা অনিষ্টকামী নয়। পারস্য, রোমক সাম্রাজ্য, গ্রীক সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক পতনের পর মদিনা সাধারণতান্ত্রিক তথা গণতান্ত্রিক, সমতাবাদী, সুবিচারবাদী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঠেকাতে ঐসব দুঃশাসনের অবশোষকরা হেন কোন চক্রান্ত নেই, যাতে লিপ্ত হয়নি। অন্যপক্ষে আল-কোরআন নবিজী ও পরবর্তী পাঁচ খলিফার দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ বিকাশের নীতি সম্পর্কে সম্যক সচেতনতা, চর্চা তথা চেতনার স্তর সমকালে প্রয়োজন অনুযায়ী বিকশিত না হওয়ায় তদানীন্তন আরব জাহানের শাসনদণ্ডধারীরা অনেকে বেপথু হয়ে যান। তবে আশার কথা এই যে, আল-কোরআন ও ইসলামের প্রকৃত স্বরূপকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। সেটা টিকে আছে, নতুন পরিবেধে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করছে, পালনবাদ বা রবুবিয়াত নামে দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ বিশ্বে শান্তির সফেদ পতাকা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। বেলায়তে মোত্‌লাকা তথা মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফও একই পতাকাবাহী নিশানবরদার।

৮. সমাজ-সংস্থার ভিটার নাম অর্থনীতি :

এতোক্ষণ যা পত্রস্থ করা হলো, তার শেকড় বা জিনোমের মূল (Genome) শেকড় 'অর্থনীতি'। আল-কোরআনে প্রত্যেক নবি-রসুল আল্লাহ্‌র মনোনীত মানব। তাঁরা স্বনির্ভরভাবে নিজেদেরকে নির্মাণ করেন। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাঁরা একেবারে হ্যভনট্‌ বা সর্বহারা, উম্মি। ইসলামের অর্থনীতির দৃঢ় ভিত্তি এখানেই প্রতিষ্ঠিত। আল-কোরআনের সূরা বাক্বারার সূচনাতেই মুত্তাকীর সংজ্ঞায় ৩নং আয়াতে সহজ ভাষায় বলা হয়েছে : "তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে দান করো।" মানব সভ্যতার ইতিহাসে আল-কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যাতে একেবারে তৃণমূল থেকেই রিযিক-জীবিকা-অর্থনীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সূরা আলাক-এর (৯৬ : ১–৫) প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিলের পর নাযিলকৃত সূরা দ্বোহা, সূরা বালাদ-এ 'দাস মুক্তি' তথা 'অর্থনৈতিক মুক্তির' উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর সাথে মানুষকে ভালো-মন্দবোধ তথা অন্তর্জাত সুবিচার-বিবেক প্রদানের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। প্রত্যেক নবি-রসুলের সমকালীন কর্মসূচি, সংগ্রামসূচির অন্যতম বিষয় ছিল অর্থনীতি। একমাত্র নিউ টেস্টামেন্টের 'মার্ক'-এর সুসমাচার ব্যতীত অন্য কোন

ধর্মগ্রন্থে সরাসরি আর্থনীতিক বিষয় পাওয়া যায় না। মার্ক-এর এ বাইবেলে হযরত ঈসাকে (আ.) সিনাগগে মুদ্রাব্যাপারী বা সুদী ঋণদাতাদের টেবিল উল্টে ফেলে দিয়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে দেখা যায়। নবুয়ত-রিসালাতধারায় হযরত ঈসার (আ.) আশু পরবর্তী উত্তরাধিকারী হলেন তথা নবুয়ত ধারার সমাপ্তি বিন্দু হযরত মুহাম্মদ (দ.)। অন্যান্য অনাচারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক শোষণ, ঠগবাজী, প্রতারণা, নির্যাতনের প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং মানবকল্যাণমুখী সুবিচার-সমতামূলক সমাজ নির্মাণই ছিল তাঁর সুবিশাল কর্মসূচি, যা স্বীয় জীবনে তিনি সমকালীন পরিবেশে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন।

৯. Dismal Science বা বিষাদ বিজ্ঞান :

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আল-কোরআন পৃথিবীতে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম অর্থনীতি নিয়েই বিশ্ব-অভিযান শুরু করেছেন, যে বিষয়টি আধুনিক পশ্চিম পরিভাষায় Dismal Science বা বিষাদ-বিজ্ঞান বা হতাশা-বিজ্ঞান নামেও অভিহিত। এই বিষাদ-বিজ্ঞানের ইতিহাসও বিষাদময়। রাজা-রাজড়ারা ছিল তাবৎ পার্থিব জমি সম্পদ এমনকি মানুষসহ সকল প্রাণীর মালিক। তাদের ইচ্ছাই ছিল আইন। ভোগের জগতেও একচেটিয়া রাজত্ব তাদের। কিন্তু সেটা তো দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে কোন প্রকারেই ন্যায় বিচারসম্মত নয়। আল-কোরআনে বর্ণিত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মানব সমাজ বিকাশের যে সুবিন্যস্ত ও জ্ঞাত বাস্তব প্রমাণপুষ্ট বিবরণেও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং এর প্রকৃতিসম্মত, যুক্তিসিদ্ধ স্থিতিশীল সমাধানমূলক পন্থার পরামর্শ ও নির্দেশনা রয়েছে, যেগুলোর কার্যকারিতা এই খ্রিস্টীয় একবিংশ শতকেও প্রবল। আধুনিক অর্থনীতির জনক হিসেবে বরিত এডাম স্মিথ ইটালীয় রেনেসাঁ পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে ইউরোপে শিল্প উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারজনিত সামাজিক তরঙ্গাভিসাতের বাচ-বিচার করে অভিমত দেন যে, “মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ভাবাবেগকে সমগ্র সমাজের স্বার্থের অনুকূলে যেন পরিচালনা করা হয়।” তাঁর ÒInquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations (1776 খ্রি.), The Theory of Moral Sentiments (১৭৫৯ খ্রি.), দুটো গ্রন্থ একাধারে মানবকল্যাণমুখী সমকালীন আর্থনীতিক সূত্র প্রকাশ করে। এতে গ্রেট ব্রিটেনের তথা ইউরোপের দরিদ্রদের দুর্দশার বেদনাদায়ক

চিত্রও ফুটে উঠে। এর জের ধরে পাদ্রী মালথাস ও ডেভিড রিকার্ডো আঁকেন এক হতাশ বিষণ্ন পৃথিবীর ছবি। নতুন স্বপ্ন নিয়ে আসেন 'স্বপ্নবাদী সমাজতন্ত্রীরা'। সমকালীন দুঃসহ পরিবেশে 'নীচু তলার আঁধারে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস ঘটান' এক অপ্রতিরোধ্য আর্থ-সামাজিক ডিনামাইটের বিস্ফোরণ। আবার এর বিপরীতে আবির্ভাব ঘটে আমেরিকায় থরস্টাইন ভেরলের মুনাফা শিকারের বর্বরতা। লর্ড কেইনসের The General Theory of Employment, Interest and Money পুস্তকে ধরা পড়লো এক 'রোগার্ত জগৎ'। ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দায় (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর) উৎকণ্ঠিত তিনি। তিনি ভীতস্বরে বললেন, 'ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের বেপরোয়া প্রচেষ্টা সভ্যতাকে ডুবিয়ে দিতে পারে।' স্বয়ংচালিত কোন নিরাপত্তামূলক অর্থ ব্যবস্থার অস্তিত্ব দৃশ্যমান হলো না। অর্থনীতির ঢেঁকি কেবলই উঠা-নামা করে। যুদ্ধ, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ অপচয় মাত্র এবং মানবসমাজ ও জাতির জন্য অন্তর্ঘাতী। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অনটনের ভয়ংকর চিত্র তিনি সেই মিশরীয় ফেরাউনী যমানা থেকেও তুলে এনেছেন তাঁর গ্রন্থে। তাঁর শেষ সাধ ছিল 'সমাজে তথা পৃথিবীতে একটা নিরাপত্তামূলক অর্থ ব্যবস্থার পত্তন' এবং অস্ত্র ও যুদ্ধ মুক্ত পৃথিবী।[১]

বলা বাহুল্য, আল-কোরআন মানব ইতিহাসের অতীতের উত্থান-পতনের তরঙ্গের আলোকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রবুবিয়াত ও রব্বানীয়াত বা পালনবাদ নামে একটা নিদান ও পথ্য দান করেছে। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত ও অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) এই শান্তিবাদী, সৃজনশীল, রবুবিয়ত বা পালনবাদী পথেরই মহান অভিযাত্রী।

টীকা:

১. বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য The Worldly Philosophers; Robert L. Heilbroner, USA, 1968. এবং উচ্চতর স্তরে পাঠ্য অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক ও গ্রন্থনাদি।

পঞ্চম অধ্যায়

আপন দর্পণে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)[১]

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই বিবৃত হয়েছে যে, অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) 'জাহেরী, পৃথিবীতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী এক দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী দাতিক: রূহানী জগতে নিভৃতচারী। ইতোপূর্বে দ্বিতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায়ে আল-কোরআন এবং বিভিন্ন মহান মনীষীর বাণী থেকে উদ্ধৃতি সহকারে তাঁর সম্পর্কে শব্দচিত্র অংকনের চেষ্টা করা হয়েছে। দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী পথিক হিসেবে তাঁর অভিযাত্রা প্রকৃত মুসলিম সুফির বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে সহায়ক উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে বিধায় তাঁর জবানীতে তাঁরই চরিত্র বিবর্তনের বৃত্তান্ত ভাণ্ডাররূপে অভিহিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ 'এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক' থেকে কয়েকটি মাত্র সাংগঠনিক, সৃজনশীল, শিক্ষা বিস্তার, জনসেবামূলক কাজের দৃষ্টান্ত সংযোজন করা হলো:

হযরতের ওফাত ও পারিবারিক এন্তেজাম :

একই সালের ১০ মাঘ মোতাবেক ২৭ জিলক্বদ ২৩ জানুয়ারি সোমবার দিবাগত রাত্রি ১টার সময় হযরত কেবলা ওফাত প্রাপ্ত হন। ইহার তেতাল্লিশ দিন পর আমার বড় ভ্রাতা সৈয়দ মীর হাসান সাহেবও মারা যান। পরে আমার ছোট ভগ্নি সৈয়দা ছফুরা খাতুনও ঐভাবে মারা যান। পরিবারে শাসন সরবরাহ যোগ্য কেহ না থাকা অবস্থায় দাদী আম্মা ছাহেবা, সৈয়দ মোহাম্মদ হাশেম সাহেবকে আমমোক্তার নিযুক্তক্রমে যাবতীয় কাজের ভার তাহার উপর অর্পণ করেন। হযরত আকদাছের ওফাতের ষষ্ঠ মাসে বাংলা আষাঢ় মাসে, হযরত বাবাজান

কেবলাকে অসুস্থ অবস্থায় সুন্দরপুর হইতে তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ গোলাম ছোবহান সাহেব সাম্পানযোগে বাড়িতে নিয়া আসেন।

অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন :

দৈব দুর্ঘটনায় অতর্কিত অগ্নিকাণ্ডের ফলে রাত্রে, দরবার শরীফ এলাকার সমস্ত ঘরবাড়ি পুড়িয়া ধ্বংস হয়। পরে দেখা যায় এই ১৯২৪ ইংরেজী সালের অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন আসিয়া যায়, যাহা বিশ্ব নিয়ন্তার নিত্য নৈমিত্তিক কৌশল। যাহার ফলে কতেক কিতাব, বহু সম্পদ, ফুসের গৃহাদি, টিনযুক্ত ঘরাদি গাছপালা বিনষ্টে বিরাট ক্ষতি সামলাইবার উদ্দেশ্যে ভিটির বিভিন্ন স্থানে হাশেম সাহেবেরা অস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। আমার বাস্তু ঘরটি মাটিয়া দেওয়াল বিধায় চালের গাছগুলি সম্পূর্ণ জ্বলিয়া গেলেও টিনগুলি পতিত না হইয়া অবয়ব ঠিকই থাকিয়া যায়। নীচের মালামালও রক্ষিত হয়। মধ্যের কাছারী দায়েরাঘর সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়। গোলাটি অধিকাংশ ধানসহ পুড়িয়া নষ্ট হয়। এহেন অবস্থায় আমার শ্বশুরও পীরে তফাইয়োজ হযরত মৌলানা সৈয়দ গোলাম রহমান কুতুবে রব্বানী (ক.) আমার উক্ত মাটির গুদাম ঘরে আসিয়া আমার পালংকের উপর তশরীফ রাখেন। আমি নিজ বিশ্রাম স্থান হিসাবে মোছাফেরখানায় অবস্থান করি। আমার স্ত্রীসহ তাঁহার (বাবা কেবলার) ঘরের মেয়েলোক পুত্রবধুগং ঐ গুদাম ঘরে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিই। সৈয়দ খায়রুল বশর সাহেবান আমার সঙ্গে মোছাফেরখানায় থাকিতে বাধ্য হন। নয় মাস এইভাবে থাকিয়া তাঁহাদের শরীকি বাস্তুঘর, কতেক পাকা ইটাসহ (এল সাইজে) গঠিত হইলে তথায় চলিয়া যান। পিছনে পাকাঘরের ব্যবস্থা না থাকায় তখন আমার বর্তমান গোলাঘরের পার্শ্বে খায়রুল বশর মিঞার সুবিধার্থে ভিন্ন একটি পাকঘরের ব্যবস্থা করিয়া স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ (করিয়া) দিলাম। (এই সময়ে) আমি হযরত কেবলার রওজা মোবারক এবং ওরশ শরীফ এন্তেজামের ভার, তহবিল শূন্য অবস্থায় উপরোক্ত জায় মানিয়া নিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথম কর্মজীবন :

আমার কর্ম জীবনে সর্বপ্রথম হযরত কেবলার নামে একখানা প্রাইমারী স্কুল / প্রতিষ্ঠা করি। পরে উক্ত প্রাইমারী স্কুলকে জুনিয়র মাদ্রাসায় পরিণত করিয়া

তাঁহার নামীয় মোছাফেরখানায় পরিচালিত করিতে থাকি। কর্তৃপক্ষ সাহায্য বহাল রাখার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার নিজস্ব গৃহ এবং জায়গার দাবী উত্থাপন করিলে খরিদক্রমেও মাদ্রাসার জন্য জায়গা দিতে অসমর্থ হইলে অগত্যা চাড়ালিয়া হাটের উত্তর পার্শ্বস্থ বর্তমান হাইস্কুল স্থিত এক একর খাস জমি অফিসারের সহানুভূতিতে বন্দোবস্তি লই। নিজের চারিকানি খাসদখলী চাষী জমি বন্ধক দিয়া মাটির গুদাম ঘর করিয়া জায়গার সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হই। এতদিন যাহাদের প্রযত্নে নিজ সংসারকর্ম চলিতেছিল ১৯১৬ইং সনে বিবাহের পরও অক্ষুন্ন ছিল বিধায় ক্রমে স্বার্থের সংঘর্ষ মাথাচাড়া দিতে আরম্ভ হইল। ১৯১৬ইং বিবাহের সময় হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত অবস্থায় থাকি। ১৯১৮ইং সালে কিছু সময় খেলাফত আন্দোলনের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকি। পরে অবাস্তব ও ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া সম্বন্ধ ত্যাগ করি। অতঃপর ১৯২১ ও ২২ইং সালে বার্মা, কলিকাতা, হুগলী, পন্ডিচেরী, দিল্লী ও আগ্রা আজমীর শরীফ ভ্রমণ করিয়া গণ সভ্যতা এবং বিভিন্ন সমাজ জীবনে ধর্মীয় প্রভাব প্রকৃতি ফলপ্রসূ কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। ১৯২৪ইং সনে ওরশ শরীফ এবং রওজা মোবারকের এন্তেজাম ভার স্বহস্তে গ্রহণ করি। (এই সময়ে) কার্যক্ষেত্রে এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হই।

প্রতিকার প্রার্থনা ও নির্দেশ :

তাই অগত্যা হযরত কেবলা সমীপে প্রতিকার (প্রার্থনায়) নালিশ পেশ করিলে স্বপ্নে জানাইলেন যে, পশ্চিম দিকে বর্তমান দরবার শরীফ স্টোরের স্থানে একটি ঘর করিয়া তোমার মালামালগুলি রাখিলে সমস্ত গোলমাল চলিয়া যাইবে। ১৯২৫ইং সনে এই উত্তর পাইলে ১৯২৬ইং সালে সাত হাত প্রস্থ ও বার হাত দীর্ঘ একখানা বাঁশের ঘর তৈয়ার করিয়া রওজা মোবারকের দরকারী বাত্তি, জ্বালানী তৈল ও অন্যান্য নিজ পারিবারিক খাদ্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মালের একখানা দোকানের পত্তন করি। পরবর্তী সনে দৈবাত সতর্কবাণী জানিয়া, রওজা শরীফের আলমারীতে খাদেম সৈয়দ মিঞা সাহেবের হেফাজতে আমার রক্ষিত খেদমতের টাকা তালাশ করিলে জানিতে পারিলাম যে, মং ১৩৪৩ তেরশত তেতাল্লিশ টাকার আন্দরমাত্র তেতাল্লিশ টাকা মওজুদ আছে। অবশিষ্ট টাকার আন্দর মং ৮০০ আটশত টাকা ----- সাহেবের পরামর্শে ধলই নিবাসী আবদুর

রহমানকে হাওলাত দিয়াছে। নিজে তিনশত টাকা কাঞ্চনপুরে মহাজনী জমির উপর লাগিয়াত করিয়াছে। কতেক টাকা তাহার শ্বশুর গংকে হাওলাত দিয়াছে। কাজেই এই তেতাল্লিশ টাকাই একমাত্র প্রাপ্য মনে করিয়া উঠাইয়া আনিলাম। নিজে অর্ধেক কাঠ পেন্সিলসহ একটি পকেট নোট বহি সঙ্গে রাখিয়া হিসাব রাখিতে আরম্ভ করিলাম। যাহার ফলে খোদার মেহেরে হিসাবপত্র বুঝিতে সক্ষম হইলাম। এই হিসাবে নানা দুর্গতির ভিতর দিয়া নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হইলাম। মাঝেমধ্যে কতেক জমা-জমিন যথা মির্জাপুরের তরফ "আমিনুল্লা জমরুদ" এবং কতেক খাস দখলী কৃষি জমাজমিন ইত্যাদি সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রাইমারী স্কুলের পুনঃ প্রতিষ্ঠা :

রহমানীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা বন্ধ হইলে তথা হইতে উত্তর পার্শ্বের পরিত্যক্ত ছোট মাদ্রাসা ঘরটি খরিদক্রমে উক্তস্থানে ভাণ্ডার শরীফ প্রাইমারি স্কুল নামে একখানা স্কুল খাড়া করিয়া শিক্ষক নিযুক্তে কাজ আরম্ভ করিলাম। খোদার মেহেরে সরকারী সাহায্য পাওয়ার পক্ষে ১৯৪৩ইং সনে আমার গড়া "কিচেন" জোনকে স্কুল জোন দেখাইয়া সরকারী সাহায্য লাভেও সমর্থ হইলাম। পরে পূর্ব পার্শ্বের মাটিয়া গুদাম এবং ধর্মপুর স্কুলের টিন, গাছ আনিয়া স্থায়ী উচ্চ প্রাইমারীতে পরিণত করিলাম।

দুর্ভিক্ষের সময় :

আমার কর্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯৪৩ইং দুর্ভিক্ষ সাল হইতে আরম্ভ হয়। যখন দেখিতে পাই, অপরিচিত ও ভিন্ন ব্যক্তিগণ, আমরা খাইতে বসিলে পাতের ভাত জবরদস্তি খাইতে আরম্ভ করে, বাহিরের পতিত উচ্ছিষ্ট বাছিয়া খাইতেছে। মন স্বভাবতই চঞ্চল হইয়া উঠে। আমি স্বভাবতই দুর্গতির প্রতীক। যেহেতু নিজে গুরুজনহারা সংসার সজাগ মননতার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে দুর্গতিতে দিশাহারা, সহায় সম্বলহীন এবং উপায়হীন হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। পরে নিজ বিপন্ন মননের ফল কিনা (তাহা) না বুঝিলেও কাহারো জীবন বিপন্ন দেখিলে নিজ জীবন বিপন্নতা অলক্ষ্যে ভুলিয়া যাইতাম। দুর্জয় সাহস ও নির্ভীক মনোবল সজাগ হইয়া উঠিত। যাহার ফলে বন্ধু মিঞা, পীং- বাচা মিঞা নামক মৃগীরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আষাঢ় মাসের ভরা পুকুরের পানির তলা হইতে নিজে ডুব

দিয়া উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সৈয়দ নুরুল হক সাহেবকে তাহার আন্দর বাড়ীর পুকুরে ভাসমান দেখিয়া উদ্ধারের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম এবং লুৎফুর রহমান নামক ব্যক্তির সাহায্য নিয়া বিশালকায় দেহটি তীরে আনিতে সমর্থ হই, পরে দেখা গেল তিনি মৃত। সৈয়দ মোহাম্মদ হাশেম সাহেবের ঘোড়া, ফাঁস পড়িয়া মারা যাওয়ার উপক্রম হইলে কেহ কাছে যাইতে হিম্মত করে নাই বটে, আমি ছোরা দ্বারা রশি কাটিয়া উদ্ধার করিয়াছিলাম। কাটির হাটের পূর্বে সিতাখালী কূলে একটি গরু এইভাবে ফাঁস পড়িয়া মারা যাইতে দেখিলে আমি পাল্কী হইতে নামিয়া ঐভাবে নিজ ছোরা দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম। ভূমিকম্পের সময় এবং বাড়িতে আগুন লাগিয়া জ্বলিবার সময়ে আগুনের বিপদ হইতে কয়েকজনকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কোন হামলার সম্মুখীন হইলে আমার মন মুষড়াইয়া পড়িত না বরং সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে মোকাবেলা করিয়া উৎসাহের সহিত কাজ করিতে অভ্যস্ত ছিলাম। যাহার ফলে আমার দয়াল মুনিবের সহায়তায় সবসময় সফলতা লাভে সক্ষম হইয়াছি। এমনকি হাসপাতালে অপারেশনের সময় ডাক্তারগণ মন্তব্য করিয়াছেন, ‘আপনার মুখমণ্ডলের ভয়ের চিহ্ন দেখি নাই, যদিও সকলের নিকট ইহা দৃশ্য হইয়া থাকে’।

অতএব, ১৯৪৩ইং সালের দুর্ভিক্ষের সময়ও উক্ত দুরবস্থা দেখিয়া কাহারো চাঁদা ছাড়া নিজে “কিচেন” খুলিতে মনস্থ করিয়া সার্কেল অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিলে মঞ্জুরী লাভ করি। দরবার শরীফস্থ খোন্দকার পাড়া, কুলাল পাড়া এবং পাঠান পাড়াসহ যাহা নানুপুর ইউনিয়ন এলাকাভুক্ত, রোসাংগিরী ইউনিয়নস্থ পূর্ব আজিমনগর এবং লেলাং ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ দমদমা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অংশ লইয়া একটি স্বতন্ত্র “কিচেন” এলাকা সাব্যস্থক্রমে কাজ আরম্ভ করিলাম। আমি নিজে প্রেসিডেন্ট এবং আজিমনগর নিবাসী আবুল খায়ের কেরানীকে সেক্রেটারী করিয়া একটি “কিচেন কমিটি” গঠন করত তাহাদের উপর বিভিন্ন কাজের ভার অর্পণে সুচারুরূপে কাজ চলিতেছিল। দক্ষিণের বড়ুয়া পাড়ার দুইটি অনাথ বৌদ্ধ ছোট মেয়ে উচ্ছিষ্ট খাইতে দেখিয়া, ঘরে নিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, এই দুইটি মেয়েকে ভাত খাওয়াইয়া কাপড়ের ব্যবস্থা কর, ফলে তাহাই হইল। কয়েকদিন পর তাহাদের মামা আসিয়া ছোট মেয়েটিকে নিয়া যায়। এই সময় দক্ষিণ দিকের রাস্তায় বাহির হইলে দেখিতে পাই, একটি মুসলমান বৃদ্ধ মেয়ে বেহুঁস অবস্থায়

মরার মত রাস্তায় পড়িয়া আছে। কাপড়চোপড়ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান। বাড়িতে আসিয়া নিজ চাষ বাড়ির চারিজন শ্রমিক লোক নিয়া ঐ বাড়ির একখানা বাঁশের দরজার উপর রাখিয়া তাহাকে বাড়িতে নিয়া আসিলাম মোছাফেরখানার একপার্শ্বের বারান্দাতে একটি চৌকি দিয়া সযত্নে রাখিয়া নানুপুরের ডাক্তার রেবতী বাবুকে ডাকাইয়া আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি ভিজিট ফি ছাড়া ঔষধের নিয়মিত মূল্য নিয়া সাহায্য করিতে যত্নবান হইলেন। একদিন পর হুঁস হইলেও চার পাঁচদিন পর মারা গেলে ধর্ম সম্মত কাফন-দাফন ব্যবস্থা নিজ প্রযত্নে সমাধা করি। “কিচেন কমিটি” মং ২৫০০/- টাকার টেস্ট রিলিফ এবং আইডিয়েল হোম মঞ্জুরী পাইলেও কার্যকরি হইতে পারে নাই।

দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হওয়ার পর একদা কুমিল্লা জিলার আজগর আলী কেরানীর স্ত্রী সাহেবানী দরবার শরীফ আসিলে অবস্থা অবগতে তিনি আমাকে বলেন, উপরোক্ত এই মেয়েটি ‘আমাকে দিলে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইব এবং ভাল ঘরে বিবাহ দিব। আমার মেয়ের মতই তাহাকে লালন পালন করিব’। মেয়েটির মত নিয়া তাহাদের সঙ্গে দিয়া দিলাম। বহুদিন পর ঐ মেয়েটি সঙ্গে নিয়া দরবার শরীফ আসিলে সে আমার নিকট পরিচয় দিয়া বলিল, আমাকে বিবাহ দিয়াছে, সুখে আছি। বর্তমানে আমি মুসলিম ধর্মাবলম্বী।

এগুলো অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র নিখাদ হক্কুল ইবাদের দৃষ্টান্ত বটে।

পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠা :

অতঃপর চিন্তা করিলাম, সেক্রেটারী আবুল খায়ের কেরানী সততার সহিত কাজ করিয়াছেন, তিনি বার্মায় পোস্টেল বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। পোস্টেল অবস্থা সম্বন্ধে অবগত, বাড়ির অবস্থাও সচ্ছল বিধায়, তাহাকে পোস্ট মাস্টার (নিয়োগ) ক্রমে একখানা পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠা করিলে এই দরবার শরীফ সংশ্লিষ্ট জনগণের উপকার হইবে। সে নিজে জায়গা ও ঘর দিয়া কাজ করিতে পারিবে এবং তাহার কর্মদক্ষতার ফলে অল্পদিনে এই অফিস সাব অফিসে উন্নয়ন সম্ভব হইবে।

ফলে কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্তক্রমে মঞ্জুরী লাভে সমর্থ হইলাম। নিজ খরচে ডাক-বাক্স ইত্যাদি সরঞ্জাম আনাইয়া লইলাম। এহেন অবস্থায় আমার বিরোধীয়গণ আমার অগোচরে তদ্বিরক্রমে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক, মসজিদের মোতোয়াল্লী ইব্রাহিম সাহেবকে (পোস্ট) মাস্টার নিযুক্ত করিয়া ওভারসিয়ার সাহেবসহ আমার নিকট আসেন। আমি বাক্স ইত্যাদি তাহার হাওলা করিয়া দিলাম এবং আপত্তি নাই জানাইয়া দিলাম। কিছুদিন কাজ করার পর বিভিন্ন আপত্তিকর অসুবিধার সম্মুখীন হইলে রহমান মঞ্জিলের উত্তর পার্শ্বস্থ বাড়ির আজিজুর রহমানকে পোস্ট মাস্টার নিযুক্তক্রমে (পূর্বের পোস্ট মাস্টার) এস্তেফা দিতে বাধ্য হন।

বাজার প্রতিষ্ঠা :

এই সময় আমার বিধ্বস্ত দারুত্তালীম লাইব্রেরী ঘর এবং পুরানা চায়ের দোকানের খালি জায়গাতে রবিবার ও বৃহস্পতিবারে বাজার জমিতে [জমায়েত] থাকে। কয়েক বছর পর তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম, তোমরা বিনাজুড়ি খালের উত্তর পার্শ্বস্থ চৌমুহনী রাস্তার মোড়ে গিয়া বস। নানুপুরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঐস্থানে খালের উপর শাহ আহমদ উল্লাহ্ রাস্তার যোগাযোগের উদ্দেশ্যে আমি একটি কাঠের পোলও করিয়া দিয়াছি। মনে করিলাম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তার উন্নয়ন হইলে বাজারের অবস্থাও অগ্রসর হইবে। আমার মনে আছে, হযরত গাউসুল আজম এই স্থানে তৎকালীন ফকিরা বাগান নামক স্থানে বসিয়া উমেদ আলী ফকির সাহেবকে বলিয়াছিলেন, "উমেদ আলী! তুমি এইখানে একটি বাজার বানাও"। তিনি খালের দক্ষিণ পার্শ্বে কতেক বটবৃক্ষের চারা লাগাইয়া পরে রবিবার বৃহস্পতিবার বাজার দিন ধার্য্যে হাট বসাইয়াছিলেন। আমি বাজার দেখিতে গেলে, তখন পয়সার পরিবর্তে সমুদ্রের কড়ির প্রচলন দেখিয়াছি। উক্ত হাট সুদিনে চলিলেও বর্ষার সময় তখন রাস্তার অভাব ও বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে দুর্গতির দরুণ বন্ধ হইতে বাধ্য হয়। ফলে আমার কথানুযায়ী সন্তুষ্টচিত্তে তাহারা তথায় চলিয়া যায়। বর্তমানে সিএন্ডবি রাস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বাজারের উন্নতি বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছে। মনে হয় এই সফলতার পিছনে হযরত আকদাছের "বাজার বানাও" বাণীর শুভাশীষই কার্যকরি হইতে চলিয়াছে। দক্ষিণে বট বৃক্ষরাজি উমেদ আলী ফকিরের দ্বারা কালে অলী উল্লাহ্র হুকুম

তামিল মান্য করার স্মৃতি ঘোষণায় সর্বক্ষণ খাড়া আছে। যেন ভবিষ্যত উজ্জ্বল দিনের পানে তাক লাগাইয়া অপেক্ষারত।

বাড়ির দোকান :

বাড়ির দোকানের জন্য নির্ভরতা হযরত কেবলার অনুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ আবদুর রহমান জ্বর অবস্থায় আসিয়া বলে, আপনার সঙ্গে থাকার জন্য আমার প্রতি নির্দেশ। আমি আসি নাই, তাই জ্বর হইয়াছে। বাবা কেবলা বলিয়াছেন, তোমাকে আমার মিঞার জন্য আনিয়াছি। এ সে বহুদিন বিশ্বস্ততার সহিত দোকানে কাজ করে। পাল্টি দোকানও হয়। তবে হযরত কেবলার নির্দেশের সঙ্গে অভয় বাণী ছিল, "এই দোকানের দ্বারা তোমার সকল অসুবিধা দূর হইবে।" অবশ্য পরে পাল্টি দোকানের সমস্ত অচল মাল উক্ত আবদুর রহমানকে বাজার মূল্য হিসাবে গছাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাকে বিগত ১৯৬৯ইং সালের মে মাসের ২৯ তারিখে আমার পারিবারিক কবর স্থানে দাফন করি এবং অপর কবর যেভাবে আছে তাহার কবরটিও স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করিয়া দিই।

কবর স্থান :

এই কবর স্থানটি এক সুরক্ষিত দেওয়াল ঘেরা বিনাড়ম্বর কবর স্থান। যাহা এই স্থানের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের কবরকে পাকা, উঁচু কবর করিয়া দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মত দালান নির্মাণে দরগাহ সাজাইয়া পয়সা রুজির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের রেওয়াজ দেখা দিয়াছে, তাহার বিপরীতপন্থায় গঠন করিয়া তথায় নিজ স্ত্রীকে দাফন করতঃ কবর দিয়া (অনুসরণীয়) আদর্শ স্থাপন করিয়াছি। নিজের জন্যও এরকম ব্যবস্থা হয় মত পাশাপাশি এন্তেজাম করিয়া রাখিয়াছি। নবি বাণী من راه منكم منكرا فليغيره بيده

হাদীসের আনুগত্যতার উদ্দেশ্যে জেয়ারত, তেলাওয়াত ও তাহলীল কাজের সুবিধার্থে এক পার্শ্বে ছোট একখানা পাকা (ছাদ) বিল্ডিংও সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ার করাইয়া দিয়াছি।

বিগত ১৯৬৮ইং সালের ৬ জুন মোতাবেক ২৩ জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৭৫ বাংলা তারিখে আমার স্ত্রী সৈয়দা সাজেদা খাতুন ওফাত প্রাপ্ত হন।

আমার তৃতীয় পুত্র সৈয়দ এমদাদুল হকের বিবাহের সময় দেশের প্রচলিত উপহার প্রথা রীতিনীতির বিপক্ষে কার্যকরি আদর্শ স্থাপন মানসে কোন উপহার 'নজর' না নেওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করি। বহু ব্যক্তি উপহার-নজর নেওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করিলেও আমি নিজ নীতিতে অটল থাকি।

হাসপাতালে কয়েকদিন :

১৯৬৯ইং সনের মে মাসে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন উদ্দেশ্যে হাসপাতালে যাই। অস্ত্রোপচারের পূর্বে ভুলিয়া যাই, আমার "ব্লীডিং টেনডেন্সি" আছে। অপারেশনের পর রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় পরের দিন দ্বিতীয় দফা অপারেশন করিতে সার্জেন্ট সরকার সাহেব বাধ্য হয়। বার বার অস্ত্র প্রয়োগ এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ দোষে আমি দুই দিন পর তৃতীয় দিনে জ্ঞান লাভ করিলেও কিছু বলিতে অসমর্থ এবং শরীর অবগতি শূন্য অবস্থায় থাকি। পরে বেশাবেশি লোকের আনাগোনার মধ্যে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনিতে ও বুঝিতে পারি। আমার হাত পা আবদ্ধ, "স্যালাইন" হাতে বিদ্ধ, রক্ত বোতল উপরে টাঙানো আছে। পরে আমাকে একটুকু স্বস্তি দেখিলে ডাক্তার বলে, "আপনার কোন মহাশক্তি আছে। না হইলে এরকম লোক বাঁচিতে পারে না।" উত্তরে বলিলাম, 'আমার কিছু নহে; যাঁহার মহাশক্তি আছে তিনি আমাকে ভালবাসেন। সুতরাং আমি যেই অবস্থায় যেখানে যাই না কেন, তিনি আমার সঙ্গে থাকেন'। খবর ছড়াইয়া পড়িলে লোকের সমাগম বাড়ার ফলে চিফ মেডিকেল অফিসার-পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আপত্তি জানাইলে, আমিও হুজুম অনিচ্ছা এবং কোনরূপ প্রচার করি নাই, তাহার ইচ্ছামত ব্যবস্থায় রাজি আছি ইহা জানাই। পরে আমার ছেলেমেয়ে ও জামাতাদের প্রতি আসিয়া সহসা চলিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিই। পথ্যাপথ্য মেঝ মেয়ে মুনিরার দ্বারা তৈয়ার করাইতাম। মাঝেমধ্যে এমদাদের বধু ও খুলু মেয়ে নাজেরাও আনিত। রুনু জামাতাসহ প্রত্যহ আসিত। জামাতা জিয়াউদ্দীন প্রায় সময় ডাব নারিকেল প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিত। একটু সুবিধার পর চিফ মেডিকেল অফিসারের পরামর্শমতে দক্ষিণ নালাপাড়ায় বাসা ভাড়া করতঃ কিছুদিন থাকিয়া চিকিৎসা করাই। সার্জেন্টগণের পরামর্শমতে নিজ বাড়ি মকামে আসি। স্পেশাল সেলুনযোগে নাজিরহাট পর্যন্ত আসি, পাল্কিযোগে বাড়ি আসার কষ্টে আমার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। বাড়িতে আসিলে বমি হয় এবং অবশ হইয়া পড়ি। বহু রাত্রে চৈতন্য উদয় হইলে দেখি কেহ নাই, অস্ফুটস্বরে

ডাকিলাম, কে আছ? পার্শ্বস্থ "কমনরুম" হইতে মনার মাতা (খাদেমা ফুলজান) বাহির হইয়া আসিল। পরে দীদার এবং মালেকও আসিল। দীদার এবং মুনির হাসপাতালে সদা সর্বদা আমার কাছেই থাকিত। দিদার মেডিকেল কলেজে পড়িত। সেবা ও চিকিৎসায় সে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বিপদ সময়ে "মেডিকেল বোর্ড" বসাইয়া সাহায্য নিয়াছিল। তাহাদের পরামর্শে ঝুঁকি নিয়া নিজেই গ্লুকোজ ইনজেকশন ইত্যাদি পুসিং করিত। শহরের কালাম সাহেব, শাহ্ আমানতের মৌলবী কামাল, মফিজ মিঞা এবং নাতিন জামাতা বখতেয়ার মিঞাগং পালাক্রমে রাতদিন পাহাড়া দিত। আমি যতদিন হাসপাতালে ছিলাম তাহারা এভাবে নিজ নিজ বাড়ি বা বাসা হইতে খাইয়া আসিয়া আমার আবশ্যকীয় খেদমত আদায় করিত। সমস্ত দিন যাহারা আমাকে দেখিতে আসিত তাহারা বহু খাদ্য-দ্রব্য মেওয়াজাত ইত্যাদি নিয়া আসিত, ঐগুলিসহ চা-পানির ব্যবস্থা চলিত। আমার ছেলেরা, ডাক্তার, নার্স, আগন্তুক সেবকগং সকলের জন্য খরচ করিত। আমি তাহাদের নিকট বহু আদরযত্ন পাইয়াছি। অপারেশন কামরায় কোন ডাক্তার বলিয়াছেন, "এই কামরায় যাহারা আসে তাহাদের মুখমণ্ডলে ভয়ের চিহ্ন দেখা দেয়, কেবল আপনার নিকট এই চিহ্ন দেখি নাই।"

গাউছিয়া আহমদিয়া মেহমানখানা :

বিগত ১৯৬০ইং সনের ঘূর্ণিঝড়ের সময় দেশের বহু ঘরবাড়ি এবং গাছপালা ধ্বংস হয়। সেই সময় হযরতের স্মৃতিজড়িত মোছাফেরখানাটি রাতে বিধ্বস্ত হয়। রাতে টিন, মূল্যবান সামানা লুট, চুরির পর প্রাতে অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা আনিয়া রক্ষা করিলাম। অতঃপর পাকা দেওয়াল ও ছাদযুক্ত ছয়খানা রিজার্ভ কামরা বিশিষ্ট, মধ্যে একটি হলঘর সমন্বয়ে ইহার পূর্ব-পশ্চিম দুইখানা বারান্দা, দক্ষিণে একখানা ছোট বারান্দাসহ সামনের পাকাঘাটের সহিত সংযুক্ত করতঃ উপরের ছাদে উঠিবার জন্য নামাযের সুযোগ সুবিধার্থে একখানা প্রশস্ত পাকা সিঁড়িরও ব্যবস্থা করিতে খোদার মেহেরে সক্ষম হই। যাহার ফলে ওরশ শরীফের সময় বহু লোকের সমাগমের দরুণ রওজা শরীফের বারান্দায় মসজিদে যেই নামাজিদের পক্ষে অসুবিধা হয়, সে অজুহাতে এস্থানটি ব্যবহৃত হয় এবং বহু লোক অল্প সময়ের জন্য ক্লান্তি দূর করিতে সক্ষম হন।

সুফি সভ্যতার প্রসার :

১৯৬৯ইং সালে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী গঠনতন্ত্র ছাপাইয়া বিলি করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানা শাখা সমিতি এবং জিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার রচিত মোসলেম আচার ধর্ম ও তজকিয়ায়ে মোখতাছার বা মূলতত্ত্বের রীতিনীতি অনুযায়ী সমাজ গঠন এবং সুফি সভ্যতার মঙ্গলদায়ীরূপে রূপায়িত করিতে চেষ্টিত হই। যাহা বেলায়তে মোতলাকা গ্রন্থে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। খাদেমানে গাউছে আজম নামে একটি সেবক সংঘ গঠন সেবার মনোভাব উৎফুল্লতা দানে মনোনিবেশ করি।

এলাকার উন্নয়ন প্রচেষ্টা :

পাকিস্তান আমলে **১।** "সিএন্ডবি" রাস্তা। **২।** এই দরবার শরীফ এলাকায় বিদ্যুৎ বাতির প্রচলন করিতে চেষ্টা করি। **৩।** পার্শ্বস্থ "সত্তা" এবং "লেলাং" নামধারী পাহাড়ি খালদ্বয়ের প্রবাহনে এলাকার খাদ্য উৎপাদন বাড়াইবার উদ্দেশ্যে একটি "সেচ স্কীম" মঞ্জুর করাইতে বারবার চেষ্টা করিয়াছি। **৪।** নিজ খামার এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ ময়ূরখিল গ্রাম এবং সমতল চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম হিলট্র্যাক্টের সহিত যাতায়াত জোন সহজসাধ্য করার মানসে মানিকপুর পূর্বদিকে প্রসারিত ফরেস্ট রাস্তা উন্নয়নকল্পে নিজ নির্মিত ময়ূরখিল-লক্ষ্মীছড়ি রাস্তা যাহা রাজবাড়ি, ঢেবাছড়ি বর্তমান সদর খাগড়াছড়ি ও মহালছড়ির বিভিন্ন এলাকার সহিত যোগাযোগ সহজসাধ্য হয়। স্থিত ধুরুং নদীর উপর একটি পোল নির্মাণের জন্য হিলট্র্যাক্ট কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম সদর জিলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। ফলে রাঙ্গামাটি-রাজবাড়ির তিনশত মাইল দূরত্ব পথ অতিক্রম সহজ হইবে।

উপরোক্ত প্রথম দফার কাজ আরম্ভ করাইতে সক্ষম হইলেও সম্পূর্ণ সমাধা হওয়ার পূর্বেই পাকিস্তান আমলের অবসান হয়। ২য় দফার কাজ বাংলাদেশ সরকারের আমলেই মঞ্জুরী লাভ করে এবং চলিত ১৯৭৪ইং সনে কাজ আরম্ভ হয়। তৃতীয় দফার কাজের ব্যাপারে জিলা "ওয়াপদা" কর্তৃপক্ষ হইতে স্বীকৃতিমূলক পত্র পাইয়া এই প্রবাহন এলাকা **(১)** গামরিতলা **(২)** মাইজভাণ্ডার **(৩)** কিপায়েত নগর **(৪)** দক্ষিণ গোপালঘাটা **(৫)** রায়পুর **(৬)** দমদমা **(৭)** পূর্ব আজিমনগর গ্রামাদির জমির মালিক কৃষকগণ সমন্বয়ে একটি "সত্তা লেলাং

প্রবাহন এলাকা কৃষি উন্নয়ন সমিতি নামে ১৫ (পনর) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়া কৃষি উন্নয়ন সমিতি গঠন করিয়া দিয়াছি।" চতুর্থ দফার কাজে, চট্টগ্রাম জিলা কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ তদন্তক্রমে আটলক্ষ টাকার এক স্কীম মঞ্জুর করতঃ এলটমেন্টের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিস পাঠাইয়া আমাকে পত্র দ্বারা ওয়াকেফহাল করিয়াছেন এহেন অবস্থায় টাকা মঞ্জুরীর পর কাজ আরম্ভ হওয়া আশাপ্রদ হইয়াছে। যাহার ফলে আমাদের যাতায়াত সুবিধা ছাড়াও দেশবাসীর ব্যবসা-বাণিজ্য পাহাড়ি সম্পদ আহরণ, খনিজ সম্পদ যাহা প্রমাণিত সত্য কয়লা, পেট্রোল, পাথর ইত্যাদি বাংলাদেশের অতি মূল্যবান উন্নয়ন সম্পদ আহরণ সহজসাধ্য হইবে। ওয়াপদা পুরানা পরিকল্পনার ধুরং প্রজেক্ট সহজে কার্যকরি হইবে। অবশ্য ইহা সরকারের বৃহৎ পরিকল্পনার অন্তর্গত এই দেশের কৃষি উন্নয়নের বিপ্লবাত্মক উন্নয়ন আনিতে সক্ষম হইবে। এই ধুরং ব্রীজ ভায়া ইছাপুর বি-ডি রাস্তা দক্ষিণে রাউজান হাটহাজারী ও রাঙ্গামাটি সড়কের সংযুক্তি ঘটিলে নিকটতমপন্থায় কম খরচে রাঙ্গামাটি, রাজবাড়ি, রামগড়, খাগড়াছড়ি মহকুমা শহর এবং মহালছড়ি থানা এলাকা সমূহের যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম হইবে। মাইজভাণ্ডার শরীফতক সিএন্ডবি বিভাগীয় রামগড় ১নং সড়ক ভায়া মাইজভাণ্ডার অর্থাৎ নাজিরহাট-মাইজভাণ্ডার সড়ক উন্নয়ন সম্ভব হইবে। ফলে মিলিটারী যোগাযোগ, নাজিরহাট রেলওয়ে স্টেশন ব্যবহারেও সুবিধা হইবে। দেশের অতি প্রয়োজনীয় শাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের ব্যাপারে সহযোগিতা লাভ করিবে। পাথরী কয়লা, রাস্তা নির্মাণ ও নদী সিকস্তী নিবারণে সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।

পাকিস্তান কবল মুক্তি :

পাকিস্তান শাসন ব্যবস্থা এই বাংলাদেশে অবসান হওয়ার প্রাক্কালে ১৯৭১ইং সালে যখন পাঞ্জাবি অত্যাচারে দেশ জর্জরিত, সেই সময় শবে বরাতের রাতে ১২টার সময় সম্মিলিত বহু লোকের কান্নার শোরে আমি ঘুম হইতে বিছানায় উঠিয়া বসি। তখন আমি শুনিতে পাই, 'আপনি আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন, এই দুঃখ-দুর্দশা হইতে আমাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? আমরা কার কাছে যাইব? আপনি গাউসুলআজম নামধারী'। জনগণ এই কালাম পড়া অবস্থায় মিছিল করিয়া রওজা শরীফের বারান্দায় দাখিল হইতেছে। আমি বসা অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে বহুক্ষণ কাঁদিলাম।

অতঃপর ফরহাদাবাদ নিবাসী মরহুম মৌলানা ইসমাইল সাহেবের সুযোগ্য পুত্র কাজি আতাউল হক সাহেব একদিন আসিয়া স্বপ্নের তাবির জানিতে চাহেন। তাহার বর্ণনা– আমি হযরতের রওজা মোবারক জেয়ারত উদ্দেশ্যে পশ্চিমের দরজার দক্ষিণ পার্শ্বে আসিলে দেখি, হযরত কেবলা পশ্চিম দিকে বাহির হইয়া আসিতেছেন। আমি সালাম দিলে হুজুর কেবলা বলিলেন, "থাম, আমি উপরে যাইতেছি।" দেখি সত্যিই তিনি আসমানের দিকে ঊর্ধ্বে চলিয়াছেন। পিছনে বহুলোক, তন্মধ্যে কাজি আছদ আলী সাহেব এবং আল্লা নিবাসী আরো দুই একজনকে চিনতে পারি। অপর সকলই আমার অপরিচিত, সবাই তাঁহার পিছনে ঊর্ধ্বের দিকে যাইতেছেন, অর্থ কি? বলিলাম, সংসারে কিছু ঘটিবার পূর্বে সূক্ষ্ম-শক্তি জগতে যাহা এই স্থূলজগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, তথায় প্রথম সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সংগঠন ও প্রতিফলন সময় চল্লিশ দিনের অতিক্রম হয় না। অতএব পাঞ্জাবি অত্যাচার এরই মধ্যে অবসান হইবে এবং তাহাদের জুলুমে অনিবার্য কারণে লোকের ফরিয়াদের ফলে তিনি কাজে নামিয়া পড়িয়াছেন। পরে দেখা যায় সায়ত্রিশ দিবসেই তাহাদের পতন ঘটিয়াছে। মাঝখানে যখন পক্ষদ্বয় পরস্পর গোলাগুলির সম্মুখীন, দেশবাসী ট্রেঞ্চ খোদিতেছে দেখিয়া, বাড়ির কর্মচারীগণও অনুমতি চাহিলে বলিয়াছিলাম থাম, স্বয়ং গাউছেআজম এই স্থানের হেফাজতের জিম্মা নিয়া সবুজ রক্ষীবাহিনী নিযুক্ত করিয়াছে। যাহাদের গায়ের কোট এবং মাথার হেট সবুজ। হেটের সামনে কপালের ঊর্ধ্বভাগে কতেক সাদা স্থানে আরবী অক্ষরে লাল রঙে লেখা আছে "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্" পরণে লুঙ্গি পায়জামা, বিভিন্ন গ্রাম্য, দেশী পরিচ্ছদে বিভূষিত বহু ব্যক্তি, কেহ মাঠে এবং কেহ গাউছিয়া আহমদিয়া মেহমানখানার ছাদের উপরে পাহাড়ায় নিযুক্ত আছে। অতএব তোমাদের কিছুই করিতে হইবে না, আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপদে রাখিবেন। বিপদ সময়ে আমি ইতিপূর্বেও ধৈর্য্যশীল ছিলাম।

যেহেতু রওজা মোবারকের বারান্দা সংস্কারের সময় দেশীয় সহানুভূতিশীল লোকেরা, কাজে বাধাদানে আক্রমণকারীদিগকে খুন করিবার অনুমতি চাহিতেছিল এবং আমাকে উত্তেজিত করার জন্য দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিতেছিল, 'শুনুন-আপনাকে গালিগালাজ দিতেছে'। আমি বলিয়াছিলাম, রসূলের চাচা আবু লাহাব, রসূলকে পাথরাঘাতে রক্তাক্ত করিয়াছিল; এইগুলোতো গায়ে পড়ে না, দিলে পড়িলেও আমি সহ্য করিতেছি। হযরতের মাজার প্রাঙ্গণে রক্তপাত হইতে

আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। পরে আমার মালিকী জমিন হইতে পুরাতন চায়ের দোকান এবং লাইব্রেরী ঘর দারুত্তালীমের বিধ্বস্ত সংবাদে জমায়েত জনতা আক্রমণ উদ্যত হইলে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম, যাহা হওয়ার হইয়া গিয়াছে, এখন হাঙ্গামা হইলে লাভ হইবে না, অথচ সামনের ওরশ শরীফ পূর্বের মত বন্ধ হইতে বাধ্য হইবে, আমার ঘাড়েই ঝামেলা আসিবে। অতএব আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ধৈর্য্যধারণ করুন। যাহারা অস্ত্র নিয়া আসিয়াছিল তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া কাছারী ঘরে জমা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। হয়তো এইগুলি সম্ভব হইতো না, যদি ইতিপূর্বের জুলুম, হামলা, অত্যাচারে আমি গা সহন অভ্যস্থ না থাকিতাম। বিভিন্ন বিপদকালে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইয়াও হযরত কেবলার অনুগ্রহে অত্যাচার ঝঞ্ঝা স্বাভাবিক ভাবে "দফয়ে" অপসারিত হইতে বাধ্য হইত। আমি পিছপাও বা পশ্চাৎপদ অনুসরণ না করিয়া নিজের কর্তব্য, লক্ষ্য পথে আবার অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা নীতি গ্রহণ করিতাম। যাহার ফলে আল্লাহ্‌তা'আলা ভালাই ও মঙ্গল দান করিয়াছেন। মনে করিতাম, নীতির মৃত্যু, আমার মৃত্যু, আমার ভবিষ্যতেরই মৃত্যু। এই ত্রিবিধ নীতিমালায় আস্থাশীল ছিলাম বিধায়, খোদার ফজলে-গাউছেপাকের মহিমায় আজ আমি সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। সমস্ত অভাবমুক্ত অসীম সুখের অধিকারী সুকৃতিধারী।

স্বাগত মাঘী তিথি :

ওহে বিশ্ব অলী! স্বাগত জানাই তোমার জন্মমৃত্যুর সমাবেশকারী বাঙালি জাতির দুঃখের অবসানে আনন্দ উন্মুখ তোমার ১লা মাঘ।

হে ১লা মাঘ! স্বাগত জানাই তোমায়, যেহেতু বিশ্ব অলী গাউসুলআজম হযরত মওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই তারিখেই জন্ম নিয়াছিলেন। তোমার দেশবাসী বাঙালিরাও আজ আনন্দমুখর। তোমারই স্পর্শে স্বগর্বে মুকুলিত বাংলার ফল, আম, জাম, লিচু ও কাঠাল রাজি। আকাশের মেঘমালা দক্ষিণা মারুত প্রবাহে ধীর গতিতে আগুয়ান ও মনের আনন্দে ছিনিমিনি খেলায় রত। গম্ভীর প্রকৃতি যেন সাধনা মগন। দেশবাসী দস্যু হানাদার-ঘাতক-ঘরবাড়ি দাহক-বিধ্বংসী, স্ত্রী জাতির ইজ্জত বিনষ্টকারী, জুলুম ব্যভিচারী সর্বস্ব লুণ্ঠনকারীর ভয়মুক্ত। এই দেশের সবুজ ধানক্ষেতের মালিক দেশের অন্নদাতা কৃষককুল খাদ্য ফলাও উদ্দেশ্যে বিশ্রাম পরিহারি নূতন বোরো চাষে

নামিয়া পড়িয়াছেন। সবুজের গায়ে বাতাসের হিল্লোলে সর্বহারাদের মনে আশার আলো দেখা দিয়াছে। বাংলার দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্নকারী মুক্তিবাহিনী আজ সফলতার গর্বে আত্মহারা। চিন্তা নায়ক বীর বাহিনী দেশ বরেণ্য নেতার হুকুম তামিলে মত্ত। শাসক সম্প্রদায় শান্তি-শৃঙ্খলা পুনর্বাসনে, বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, অচল শিল্প, বিচ্ছিন্ন যাতায়াত ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে সংহতি রক্ষা, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি সৎভাব সম্প্রীতি স্থাপন ও পর্যুদস্ত অর্থনীতির পুনঃবিন্যাস ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত। এই নদী মেখলা বাংলার চরাঞ্চল বালির তলে, অর্ধতলে নর কঙ্কালরাজিঃ এই নদীর স্রোত বিদীর্ণকারী তরী, নৌকা, জলযান, মাঝি-মাল্লাদের কোলাহল শুনিতে যেন কান পাতিয়া রহিয়াছে। ঐ নরঘাতক দুর্দান্ত, পশ্চিমা সৈনিকদের অত্যাচার ভয়ে যাহারা বাড়ি ছাড়িয়া বন-জঙ্গলে, সাপ, বিচ্ছু ও বাঘ-ভল্লুকের সঙ্গে জীবনযাপনে বাধ্য হইয়াছিল, নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিবার পরে দেখে যেইসব স্থানে ঐ নরপিশাচ সৈনিকেরা আড্ডা জমাইয়াছিল তাহার পার্শ্বস্থ গুহাগুলি নিরস্ত্র বাঙালির কঙ্কালে ভর্তি, চক্ষুহারা বিস্ফোরিত কোটরগুলি তাক লাগাইয়াছে– ঐ নরঘাতক দল আবার আসিতেছে কিনা? ধন্য তোমার দশই মাঘ, এই তারিখের তিথিতে বিশ্বের পঞ্চম ধর্মীয় সম্মেলন "ওরশ শরীফ" মাইজভাণ্ডার গ্রামে বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষের অমর স্মৃতি সংঘটিত হয়। তোমারই স্নিগ্ধ রসাল মাটিতে রক্ষিত আছে– ঐ অমর পবিত্র দেহ মোবারক।

ওহে বারে খোদা।

এয়াসিন সূরা এবং সূরা তবারকের বরকতে আমার এই শেষ বিবৃতিটিও

তোমার দরবারে গৃহীত হউক।

আমিন।

টীকা:

১. রেনেসাঁ যুগের একটি দিক থেকে উৎকলিত

পরিশিষ্ট

আধ্যাত্মিক-সামাজিক সাংগঠনিক নির্দেশনা

১. অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) 'বেলায়তে মোত্‌লাকা', 'হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনী ও কেরামত', 'মানব সভ্যতা'র মতো গুরুভার পুস্তক-নিবন্ধাদি বাংলাভাষী ত্বরিকতপন্থীদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন। এরই পাশাপাশি তিনি 'মুসলিম আচার ধর্ম'-এর মতো আটপৌরে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য পুস্তিকা রচনা করে সমকালে স্বল্পমূল্যে উর্মি মানুষের ঘরে ঘরে নামায-কালাম শিক্ষার অন্যতম উপকরণ সরবরাহ করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে ঐ সময়ে ঐ ধরনের অতি 'সাধারণ প্রয়োজনীয়' এ ধরনের পুস্তিকার খুবই দরকার ছিল। বাল্যকালে প্রাইমারী স্কুলেও 'সহজ নামায শিক্ষা' ধরনের পুস্তিকা পাঠ্য থাকতো। পাড়া-মহল্লার মৌলভী-ইমাম সাহেবরা মসজিদের বারান্দায় কিম্বা দরস গাহে মধুর সুরে সুরে শিশু-কিশোরদের এগুলো মুখস্ত করাতেন, নামাযের প্রত্যক্ষ তালিম দিতেন। পূর্ব বাংলার পল্লী গ্রামের মুসলিম সমাজের এই ঐতিহ্য মাটি-মানুষের সাথে সম্পর্কহীন বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে সাময়িক ন্যূব্জ হয়ে পড়েছে বলে সমাজবীক্ষকদের ধারণা। একদা চাষীরা যখন গাঁয়ে কাঁচা সরুপথ ধরে হাল চষতে যেতেন তখন মাটি কিম্বা বেড়ার মসজিদ থেকে বিভিন্ন সূরা, দরুদ শরিফের কোরাস ভেসে আসতো শিশু কণ্ঠে। আর পথ চলতি কিষান মুরুব্বিরাও কদম চালাতে চালাতে গুণ গুণ করে গেয়ে উঠতেন– 'এয়া নবি সালাম আলাইকা'।

২. সময়ের চাহিদাকে পূরণকল্পে মসৃন আইনী রূপরেখা সম্বলিত পুস্তিকা বাংলাভাষী ত্বরিকতপন্থী ও সৎ উদ্যমী, শিক্ষিত, সেবামুখী, গতিশীল তরুণ-যুব সমাজ তথা জনগণের জন্য তিনি রেখে গেছেন এবং স্বীয় জীবদ্দশায় কার্যক্ষেত্রে সফলভাবে এস্তেমাল করে গেছেন। এই পুস্তিকার নাম 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী'-এর গঠনতন্ত্র। এই গঠনতন্ত্রের মুখবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেন, "বিশ্ব দরদী শান্তিকামী সেবক হিসাবে আমরা হযরত আক্দসের বিশ্বত্রাণকর্তৃত্ব বাণী বিশ্বের উন্মুখ খোদানুরাগী জনগণের নিকট পৌঁছাইতে মনস্ত করিয়া, এই সেবাধর্ম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি, যাহা বিগত ১৯৪৯ইং সালে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে প্রথম পত্তন হয়।"

স্বাক্ষর ও নাম : সাজ্জাদানশীন খাদেমুল ফোক্বারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, প্রতিষ্ঠাতা, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী।

এই গঠনতন্ত্র বা উপবিধি (Bye-laws) প্রচলিত আইনের ভাষায় Procedural law বা কার্যপ্রণালী ঘটিত আইন ও বিধি (Rules) হিসেবে গণ্য, যা সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তামণ্ডলী এবং বিধি অনুমোদিত সদস্যবর্গের অবশ্যই পালনীয়। বর্তমানে কলেজ-মাদ্রাসা নির্বিশেষে বহু তরুণ যুবা দলীয় রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী সমাজসেবা সংগঠনের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করছেন। ত্বরিকতপন্থীরাও নিজেদের বিশেষ ইতিবাচক পরিচিতি হিসেবে এ ধরনের সংগঠনের সামিয়ানাতলে সমবেত হবেন। সততা, শিক্ষাগতসহ আনুষাঙ্গিক যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও সুবিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই এখানে হাল ধরবেন। এতে জীবনী-শক্তি বা গতিশীলতা অপ্রতিহত রাখার উদ্দেশ্যে পরিচ্ছন্ন গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতৃত্ব বা গাইড নির্বাচিত হবেন এক দফায় সর্বোচ্চ দুই বছরের জন্য। কোন প্রকার রদ-বদল নির্বাচনের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হবে। নবতর গতিশীল (Radical) নেতৃত্ব উৎপাদন করা নির্বাচনের অন্যতম উদ্দিষ্টও বটে। মেয়াদ বাড়ানোর কোন বাহানা তোলা যাবে না। হিসাব-কিতাব, লেন-দেন উন্মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আর্থিক ও নৈতিক সততাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রথমত নিজ বিবেক এবং 'সাধারণ সভা' নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে যথাবিধি জবাবদিহি থাকতে হবে। তবেই অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.)-এর চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নবিজী (দ.) ও ইসলামের ইপ্সিত পায়রবী করা হবে।

এখানে সবিশেষে প্রণিধানযোগ্য যে, এই সংগঠন তৈরি তাঁর জাহেরী সংগঠন মনস্কতা, সাংগঠনিক প্রতিভা এবং বিবিধ প্রকার প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতা ঠেকিয়ে সম্মিলিতভাবে কাজের আঞ্জামে নেতৃত্ব দেবার সক্ষমতার পরিচায়কও বটে। অবশ্য এমন বহু দৃঢ় দৃষ্টান্ত তিনি বিগত শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই স্থাপন করেছেন।

এই গঠনতন্ত্র বা উপবিধি কেবল গাউসিয়া হক মন্‌জিল নয়, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের অন্যান্য মহান মন্‌জিলসমেত সকল ত্বরিকত, অধ্যাত্ম কেন্দ্রের গাইড হিসেবে ফলপ্রসূ হবে। আমাদের উঠতি তরুণ সমাজকে সৎ গণতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিকায় অভ্যস্ত হবার তালিম যোগাবে, যা এ মুহূর্তের বাংলাদেশ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মডেল বা আদর্শ হিসেবে এই গঠনতন্ত্র নিম্নে মুদ্রিত হলো, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে যে কোন মহলে তা এস্তেমাল করা যাবে বলে ধারণা করা যায় :

উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্য

১। হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর ভক্ত, অনুরক্ত ও আশেকানদেরকে তাঁহার পবিত্র আদর্শে অনু-প্রাণিত করা।

২। ছালেক-সজ্ঞান খোদা-পথচারীকে নিয়মতান্ত্রিকতা ও শৃঙ্খলার দিকে আকৃষ্ট করা এবং হালাল ও সৎ রুজির চেষ্টায় উৎসাহিত করা।

৩। কলন্দর, মজজুব ও মগলুবুল-হাল বা ভাব-বিভোরচিত্ত ফকির-দিগকে বিভিন্ন আচার ও ধর্মীয় নিয়মমুক্ত ফকির বলিয়া স্বীকার করা এবং আচার-ধর্ম গোঁড়া লোকদের জুলুম ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করা।

৪। এই মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার অনুসারীদিগকে ইসলামী শরার বিধান মানিয়া চলিতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগীতা করা এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করা।

৫। ছুফী মতবাদী সম্প্রদায়ের সহিত ঐক্য বৃদ্ধি করা।

৬। এই মতবাদী জনগণের মুখপাত্র হিসাবে বার্ষিক বা ষান্মাসিক একটি সাময়িকী বা ম্যাগাজিন প্রকাশ করিয়া তাহার মাধ্যমে এই তরীকার বৈশিষ্ট্যাদি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করা।

৭। এই তরীকার মতবাদী জনগণের অভাব-অভিযোগাদি সরকার সমীপে পেশ করা এবং যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

৮। নৈতিক শিক্ষার জন্যঃ- (ক) দারুল এরফান (পরিচয় জ্ঞান), (খ) দারুল মোনাজেরা (ভাব বিনিময় জ্ঞান), (গ) দারুল এবলাগ (প্রচার জ্ঞান) ও (ঘ) দারুল এফতা (বিধি ব্যবস্থা) জ্ঞান দায়ক লাইব্রেরী শিক্ষার (দারুত তায়ালীম) বা শিক্ষাগারের ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত ৮নং ধারার বিশ্লেষণ

১ম মান- (دار العرفان) দারুল এরফান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

(ক) এই মানে তাছাউফ বা আত্মশুদ্ধির নীতিকথা মৌখিক না লিখিত বই পুস্তক মূলে যথা, (১) বেলায়তে মোত্‌লাকা (২) মূলতত্ত্ব (৩) আয়নায়ে বারী (৪) মওলানা হাদী ছাহেব এবং দরবারী বিভিন্ন সুধিমণ্ডলী প্রণীত বই-পুস্তক, গান-গীতি, উপদেশাবলী, ইত্যাদিমূলে শিক্ষা দিতে হইবে।
(খ) সুপ্রসিদ্ধ বুজর্গানেদীনের জীবনী, বাণী বা কথামৃত এবং তাঁহাদের প্রচলিত বিভিন্ন তরীকা বা নিয়ম-পদ্ধতি ও আত্মশুদ্ধির পক্ষে কার্যকরী নিয়মাবলী জিকির, স্মরণ-সম্পর্ক বিষয়ে অভিহিত করা।

(গ) মোজাদ্দেদে জমানায়ে বেলায়তে মোত্‌লাকা খাতেমে জমানায়ে বেলায়তে মোকাইয়্যাদা হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ ছুফী ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্, মালামিয়া কাদেরী (ক.) প্রবর্তিত اصول سبع বা বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন “সপ্ত পদ্ধতি” যথাযথ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া।

যথা:-(১) ফানায়ে ছালাছা বা আত্মশুদ্ধির ত্রিবিধ বিনাশ অবস্থা।

(ক) ফানা আনিল খাল্‌ক-অর্থাৎ স্বাবলম্বী হওয়া বা পরমুখাপেক্ষিতা হইতে বিমুখ হওয়া কিম্বা কাহারও উপকারের প্রত্যাশা না করা। (খ) ফানা আনিল হাওয়া-অর্থাৎ অনর্থ কাজ ও কথা হইতে বিরত থাকা ও (গ) ফানা আনিল এরাদা অর্থাৎ নিজ ইচ্ছাকে খোদার ইচ্ছাশক্তির নিকট বিসর্জন দেওয়া। ছুফী পরিভাষায় যাহাকে তছলিম বা রজা বলে।

(২) মউতে আরবায়া বা চতুর্বিধ বাসনার মৃত্যুবরণ।

(ক) মউতে আবয়্যাজ-যাহা উপবাসে, ত্যাগে ও সংযমে আয়ত্ব হয়। বাংলা ভাষায় যাহাকে সাদা-মৃত্যুর আলো-অর্জন বলা হয়। (খ) মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যু-ইহা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে অর্জন হয়। (গ) মউতে আহমর বা লাল-মৃত্যু-যাহা অতি-লোভ ও কামভাব পরিহারে অর্জন হয় ও (ঘ) মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু-যাহা নিবিলাস জীবন যাপনে অর্জন হয়। (বেলায়তে মোত্‌লাক গ্রন্থে বিশদ ব্যাখ্যা আছে)। এই স্তরে উন্নীত ব্যক্তির বেলায়তকে বেলায়তে-খিজরী বলে। তাঁহারা ছাহেবে তছরোফ বা রোহানী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হইতে দেখা যায়। তাঁহারা যাহা বলেন বা ইচ্ছা করেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহা মঞ্জুর করেন। যেমন, মওলানা রূমী (র.) বলেন–

علم حق در علم صوفی گم شود - این سخن کئے باور مردم شود

হজরত আকদাছের এই বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর বদৌলতে বা প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার জঞ্জালপূর্ণ নিগড়ে আবদ্ধ বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদী যুগের সাধনা-পদ্ধতি বা তজকীয়ায়ে নফছের বিধি-ব্যবস্থার তুলনায় মানবিয় চারিত্রিক উন্নয়ন, সংসার জীবন-যাত্রা সুগম, ভৌতিক আড়াল মুক্তি ও খোদা-সান্নিধ্যতার দিক দিয়া এই “উছুলে-ছাবয়া বা সপ্ত-পদ্ধতি”কে ঝামিলা-মুক্ত, সহজ-সাধ্য এবং সার্বজনীন রূপে দেখা যায়।

অতএব, বিশ্ব-কল্যাণকামী জনগণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই বিশ্ব-মঙ্গলদায়ী সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বীকার করা উচিত যে, (১) আমি অদ্বৈত খোদা শক্তিতে বিশ্বাসী ও একত্ববাদী, (২) কর্মফলের প্রতি আস্থাশীল ও সৎকার্যানুরাগী, (৩) পূর্ণ-মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির ফজিলতে রব্বানী বা খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী এবং (৪) নিজ দৈহিক প্রেরণা বা ভৌতিক-কামনার আড়াল মুক্তি এবং বিশ্ব-সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনোদ্দেশ্যে ‘বেলায়তে মোত্‌লাকার’ বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ‘সপ্ত-পদ্ধতিতে’ আস্থাশীল।

২য় মান- (دارالمناظره) দারুল-মোনাজেরা বা ভাব-বিনিময়।

এই মানে লাইব্রেরী শিক্ষার মাধ্যমে নৈশ-শিক্ষার প্রবর্তন। যাহাতে শিক্ষণীয় থাকিবে (১) বর্ণজ্ঞান (২) কলেমা (৩) আচার-ধর্ম বা উপাসনার নিয়মাবলী (৪) দৈহিক সাবলম্বী প্রেরণাদায়ী কর্ম ও উহার সন্ধান ও সম্ভব মত সাহায্য ব্যবস্থার উপায় (৫) শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি স্ব-ধর্মে আস্থাশীল ও আচরণকারী কি না খবর লওয়া এবং (৬) আমাদের সমিতির কর্ম-পদ্ধতি ও লক্ষ্য বস্তু এবং উদ্দেশ্য ও নীতি সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচার বা তবলীগ।

৩য় মান- (دارالافتاء) দারুল এফতা বা বিধি-ব্যবস্থা।

ইহা সদর কার্যকরী সংসদের নিয়ম অন্তর্গত বিধি-ব্যবস্থা জ্ঞান। যাহা সদর কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ কর্তৃক প্রবর্তিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন জনিত আইন-কানুন বিধি ব্যবস্থাময় শৃঙ্খলাকে বুঝাইবে।

৪র্থ মান- (دارالابلاغ) দারুল এবলাগ বা প্রচার সমবায় গঠন।

এই মানে থাকিবে, (ক) এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪র্থ শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত একজন নিয়মিত সদস্যের নেতৃত্বে গঠিত প্রচার-দল। যাহারা দায়রা এলাকাগুলিতে সমিতির রীতি-নীতির তবলীগ বা প্রচার করিবেন। (খ) অন্ততঃ মাসিক একবার জনগণকে খোদা-স্মরণ আনন্দ দান করিবেন। (গ) জিলা সদর কার্যালয় হইতে সাময়িকী, প্রবন্ধ, বুলেটিন, ইত্যাদি দ্বারা সমিতির উদ্দেশ্য ও মঙ্গলদায়ী কার্যকারিতার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়াইতে চেষ্টা করিবেন। মধ্যে মধ্যে সমিতির মূলনীতি বজায় রাখিয়া নিজ-শ্রেণীর জনগণকে খোদা-স্মরণ আনন্দ দান করিবেন। (ঘ) প্রত্যেক বাংলা মাসের ১০ তারিখে মিলাদে গাউছে আজমের পর কেন্দ্রীয় সংসদের দারুত-ত্বায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, সমিতির উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপস্থিত জনগণকে অভিহিত করিবেন। (ঙ) সম-বৎসরে দুই বার যথা, ২৭শে আশ্বিন এবং ২২শে চৈত্র উপযুক্ত কনফারেন্স বা সম্মেলন

আহ্বান করিয়া সমিতির উদ্দেশ্যাবলী ও কার্যকারিতা প্রচার করিবেন। যাহাতে দেশবাসী এই সমিতির গুণাগুণ সম্বন্ধে অভিহিত হইতে পারেন। (চ) প্রত্যেক বৎসর ১০ই মাঘ তারিখে সাময়িকী, বুলেটিন, রিপোর্ট আকারে সমিতির উদ্দেশ্য, নীতি, প্রগতি ও কার্যকারিতা এবং হজরত আকদাছের ফজিলত, তাঁহার ওরছ শরীফের খবর, ইত্যাদি প্রচার করিবেন। (ছ) দেশীয় পত্রিকা, পঞ্জিকা, বেতার, ইত্যাদি বার্তা-সরবরাহের মাধ্যমে অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানাদি রক্ষার জনগণকে তাহাদের দৃষ্টিপথে এই দরবারের বৈশিষ্ট্যতার পরিচয়ের নমুনা তুলিয়া ধরিবে। (জ) এই বেলায়তে মোতলাকার বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছিয়াতের পরিচয় ও ফজিলত সম্ভব হইলে বেতার মারফত বিশ্বের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইতে হইবে এবং (ঝ) বিশ্ব-সাম্যকামী সামাজিক সংস্থাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করিতে হইবে।

৯। “খাদেমানে গাউছে আজম” নামে এক স্বেচ্ছাসেবক সংঘ গঠন করা এবং শিক্ষা দেওয়া।

১০। এই আঞ্জুমানের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও নির্দিষ্টভাবে তদ-নিয়মাবলীর ব্যবস্থা করতঃ নিয়ম-বিধি লিপিবদ্ধ করা।

১১। সম্ভব হইলে প্রচারের সুবিধার জন্য সমিতির নিজস্ব ছাপাখানার ব্যবস্থা করা, যাহা দ্বারা সহরের কার্যালয়ের অভাব দূরীভূত করা সম্ভব হইবে।

উদ্দেশ্যাবলীর বিশ্লেষণ

১ম উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা

সকলের ধর্ম অনুভূতি সম্পন্ন বিবেকমতে হজরত আকদাছের প্রবর্তিত ‘উছুলে ছাবয়া’ বা ত্রাণ কর্তৃত্বে মুক্তি হাছিল হওয়া মতে চলা। জিকির ও ছামার মজলিসে নিয়ম-দস্তুর ও ধর্মীয় আদব রক্ষা করা, যাহাতে হাল্-জজ্‌বা ও নৈতিক চরিত্রের উন্মেষ হয়।

২য় উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ (নিয়মতান্ত্রিকতা)

(ক) 'মায়ামেলাতে এতেবারিয়া' বা পরস্পর সম্পর্কজনিত স্বার্থ এবং 'এবাদাতে মোতনাফিয়া' অর্থাৎ স্ব স্ব ধর্ম-কর্ম, নিয়মানুযায়ী নিষ্ঠার সহিত পালন করা। সব সময় বাহিরে, ভিতরে শুচি বা পাক-পবিত্র থাকিতে চেষ্টা করা যেহেতু তিনি বাণীতে এবং দৈনিক বহুবার অজু করা নিয়ম-দপ্তরে এই নৈতিকতাগুলি, পরিস্ফুটিত ও বিকশিত। (খ) পরস্পরকে হালাল রুজির জন্য সম্ভবপর সহানুভূতিশীল সহযোগীতা করা। সৎরূজির উদ্দেশ্যে উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টাশীল থাকা যাহাতে এই সমিতির জনগণ অভাবমুক্ত হইতে সমর্থ হয় এবং আত্ম-নির্ভরশীল হয়।

৩য় উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ

দুর্নীতিপরায়ণ ভণ্ডলোক ছাড়া ধর্মপ্রাণ বিভোর-চিত্ত মজ্‌জুব কলন্দর, হালজজ্‌বার অধিকারী ফকিরদের প্রতি স্বার্থপর, জুলুমবাজ, আচার-ধর্ম গোঁড়াবাদ লোকের ফ্যাছাদ হইতে বাঁচিতে বা বাঁচাইতে আইনানুগ ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্থানীয় সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা এবং যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। সম্ভবপর ফ্যাছাদ পরিহার করিয়া চলিতে চেষ্টিত থাকা।

৪র্থ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ (ধর্ম নিরপেক্ষতা)

কোন ধর্মীয় রীতি-নীতির বিরুদ্ধে উসকানী সৃষ্টি না করা। নিজ নিজ ধর্ম বিবেক মতে ধর্মে নিষ্ঠাবান থাকা এবং অপরকেও অনুরূপ থাকিতে সাহায্য করা।

৫ম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ (ঐক্যবৃদ্ধি)

কোন বুজর্গানের তরীকার বা ধর্মীয় কর্মপন্থার বিরূপ সমালোচনা না করা। পবিত্র প্রেরণাতে অভিন্ন দেখা, যেহেতু সকলই বিভিন্নরূপ চেষ্টার ফলে কার্যক্ষেত্রে একই স্থানের সন্ধানে রত দেখা যায়; যাহাকে খাহেশাতে নফছানীর কামস্পৃহার বিসর্জন বা বিনাশই বুঝায়।

৬ষ্ঠ ও ৭ম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ (প্রচার পদ্ধতি)

রাজনৈতিক ছাড়া, ধর্ম-চর্চার নৈতিক উৎকর্ষতার উদ্দেশ্য বজায় রাখা, বিধান ধর্ম বিরোধ পরিহার করা এবং নিজ নীতিতে নিষ্ঠাবান থাকা।

এই সমিতির অন্তর্ভূক্ত জনগণের অভাব-অভিযোগাদি সরকার সমীপে পেশ করিয়া যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

৮ম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ (শিক্ষা পদ্ধতি)

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর ১৪/১০/৪৯ ইং তারিখের সাধারণ সভার নির্ধারিত নিয়ম-দস্তুর অনুযায়ী প্রচলিত দারুত-তায়ালীম শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা এবং প্রত্যেক শাখা-দায়রা সমিতিগুলিতে সু-শিক্ষার প্রচলন করা যাহা বয়স্ক শিক্ষাকে সামিল করে। ঐ মতে, শাখা সমিতিগুলির ২/৩ জন সদস্যকে শিক্ষা দেওয়া।

৯ম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ

খাদেমানে গাউছে আজম নামক সেবক শাখা-সংঘকে আরো শক্তিশালী করা। প্রত্যেক শাখা-দায়রা সমিতিগুলি হইতে সেবক সংগ্রহ করা এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন পূর্বক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা।

১০ম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ-(আইন-কানুন)

(ক) আবশ্যক বোধে সমিতির কার্যকরী সংসদ উন্নতি ও প্রগতির জন্য মূলনীতি বজায় রাখিয়া অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার নিয়ম দস্তরের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ থাকিবেন। শিক্ষার নিয়ম-কানুন ঠিক করিতে পারিবেন।

(খ) গত বৎসরের রিপোর্ট এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাজেট ও রিপোর্ট তৈয়ার করিবেন।

(গ) সদস্যদের যোগ্যতা ১৯৬৯ সালের সংশোধিত সংগঠন ফরমের ২নং (ক) ধারা মতে হইতে হইবে।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ

চলিত ১৯৬৯ সালের সংশোধিত ও বর্ধিত নিয়মাবলী বিগত ১৪/১০/৪৯ ইং তারিখের নিয়মাবলীর সংশোধনী রূপে সাব্যস্ত হইবে।

(ক) আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর সদস্য পদের যোগ্যতা

নবি, রছুল এবং অলীয়ে কামেল বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির ফজিলতে রব্বানী বা খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী মাওয়াহেদ বা একত্ববাদী অদ্বৈত খোদার প্রতি বিশ্বাসী, কর্মফলের প্রতি আস্থাশীল ও সৎকার্যা নুরাগী। নিজ নৈতিক আধার বা নাছুতী প্রেরণা হইতে মুক্তি এবং তজকীয়ায়ে নফছ হাছিল উদ্দেশ্যে হজরত গাউছে আজম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রবর্তিত, বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন (اصول سبع) উছুলে ছাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি। (যাহা তিন প্রকার বিনাশ ও চারি প্রকার প্রবৃত্তির মৃত্যু নামে অভিহিত)। এই সপ্ত-পদ্ধতিতে আস্থাশীল সজ্ঞান বয়স্ক ব্যক্তিই এই আঞ্জুমান বা সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

(খ) সভ্য-শ্রেণী

যে ব্যক্তি উপরে বর্ণিত মূল-নীতি স্বীকারে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী সমিতির আইন-কানুন, নিয়ম-দস্তুর মানিয়া চলার ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত বা টিপ-সহি দিয়া স্বীকৃতি প্রদান করেন তিনি সাধারণ সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

(গ) বিশেষ সভ্য

যাঁহারা উপরে বর্ণিত দস্তুর স্বীকৃতি পূর্বক সভ্য হইয়া, দরবার শরীফে প্রতিষ্ঠিত মূল কেন্দ্রীয় বা সেন্ট্রাল আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী কার্যালয়ে এক টাকা সভ্য-ফিস দাখিল করতঃ বিশেষ সভ্যের রসিদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ-সভ্য শ্রেণীভূক্ত হইবেন। মন্তব্য ঘরে ঐ রসিদ নং উল্লেখ থাকিবে।

(ঘ) পদাধিকার বলে সভ্য

(১) মোন্তাজেমে দরবারে গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল এবং হজরত আকদাছের রওজা শরীফ, হুজরা শরীফ, ওরছ শরীফ ও মেহমান খানার এন্তেজামকারী ঐ আওলাদ ব্যক্তি একজন। (২) হজরত আকদাছের পুত্র-বংশ মনোনীত খাছ আওলাদ একজন আজীবন সভ্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। (৩) দারুত-তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক একজন, মোট তিনজন সদা সর্বদা পদাধিকার বলে সভ্য থাকিবেন।

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর সদস্য পদ লাভের স্বীকৃতিপত্র

আমি নিম্ন দস্তখতকারী স্বীকার করিতেছি যে, (ক) এই সমিতির মূল উদ্দেশ্যবলী অর্থাৎ আমি নবি, রছুল এবং অলীয়ে কামেল বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত ব্যক্তির "ফজিলতে রব্বানী" বা খোদায়ী শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী। (খ) অদ্বৈত খোদা শক্তিতে বিশ্বাসী ও একত্ববাদী, (গ) কর্মফলের প্রতি আস্থাশীল, (ঘ) সৎকার্যানুরাগী এবং নিজ নৈতিক আধার বা নাছুতী ভৌতিক প্রেরণার আড়াল মুক্তি ও তজকীয়ায়ে নফছ হাছিলের উদ্দেশ্যে, হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারীর প্রবর্তিত সপ্ত-পদ্ধতি বা اصول سبع তিন প্রকার প্রবৃত্তির বিনাশ ও চারি প্রকার মৃত্যু; এই সপ্ত প্রকার বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন পদ্ধতিতে আস্থাশীল, (ঙ) এই সমিতির নিয়ম- তান্ত্রিকতা ও আইন-কানুন সমূহ বর্তমানে যাহা আছে অবগত হইয়া স্বীকার করিতেছি যে, আমি সব সময় এই সমিতির অনুশাসন রীতি-নীতি মানিয়া চলিব, (চ) আমার ধর্ম-বিশ্বাস মতে এই রীতি-নীতি মানব জাতীর নৈতিক উৎকর্ষতার জন্য একান্ত উপাদেয় ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি; এবং ইহা সর্বতোভাবে বিশ্ব-শান্তি আনয়নকারী ও নিজপারিবারিক জীবনধারায় বান্ধবগ্রাহী, স্বাচ্ছন্দদায়ী অথচ ব্যক্তি জীবনের পক্ষেও আনন্দদায়ক এবং আধ্যাত্মিকতার উন্নয়নকারী। বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন গুণে গুণান্বিত, (ছ) ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, আমি সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে এই সমিতির বিরুদ্ধাচরণ বা হানিজনক কাজ করিবনা। ঐরূপ অহিতকামী লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিবনা এবং

কোন প্রকার সাহায্য সহানুভূতি দিবনা। এই করারে সুস্থ শরীরে সজ্ঞানে, বিনা প্ররোচনায় বা বিনা যবরে স্বীকার সম্মত হইয়া দস্তখত বা স্বাক্ষর করিলাম এবং সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করিলাম।

২য় অনুচ্ছেদ

সংগঠন

এই আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী নিম্নলিখিত ভাবে সংগঠিত হইবে:-

(ক) শাখা-দায়রা কার্যকরী সংসদ:-

এই কার্যকরী সংসদ নিজ এলাকা বা 'জোনের' উপরে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ভক্তগণ লইয়া সংগঠিত হইবে। যথাঃ-

সাধারণ সভ্য এবং বিশেষ সভ্য সমভিব্যাহারে ঐ জনগণের মতামতে বিশেষ সভ্য শ্রেণীর দশজন লইয়া শাখা-দায়রা কার্যকরী সংসদ গঠিত হইতে পারিবে। প্রত্যেক দায়রা এলাকার জনগণ হইতে অন্ততঃ ২/৩ দুই কিম্বা তিন জন লোক কেন্দ্রীয় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ দারুত-তায়ালীমের শিক্ষা বা ট্রেনিং লইতে হইবে। এই সদস্য পদবীতে তাহাদের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। তাহাদের দশজনের মধ্য হইতে একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইবেন।

(খ) জিলা সদর কার্যকরী সংসদ

এই সংসদ সদর জিলা 'জোন' বা এলাকার বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ভক্তগণ লইয়া গঠিত হইতে পারিবে। 'অফিস বেয়ারার' ইত্যাদি এবং শিক্ষা বা ট্রেনিং উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী থাকিতে হইবে।

(গ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ

এই কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদে (১) মোনতাজেমে গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল, (২) ঐ হুজুরে আকদাছের পুত্র-বংশগণের দ্বারা মনোনীত, একজন খাছ পুত্র বংশধর মনোনীত ব্যক্তি আজীবন সভ্য, (৩) দারুত

তায়ালীমের প্রধান শিক্ষক, এই তিন জন পদাধিকার বলে; অবশিষ্ট আট জনের মধ্যে একজন অর্গানাইজার, স্থানীয় দায়রা এলাকার সম্পাদক এবং বিশেষ সভ্য পদবীর একজন স্থানীয় সভ্য এবং জিলা সদর সংসদের 'অফিস বেয়ারার' এবং মনোনীত সভ্য সহ পাঁচজন। মোট **১১** (এগার) জন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ গঠিত হইবে।

(ঘ) সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদ

এই সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদে (১) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সমস্ত সদস্য, (২) জিলা সদর কার্যকরী সংসদের সমস্ত সদস্য, (৩) শাখা দায়রা সংসদের সমস্ত বিশেষ সভ্যগণ ভোট প্রদানের অধিকার সম্পন্ন সদস্য। এই সমিতির সমস্ত এলাকার সকল সংসদের সাধারণ সদস্যগণসহ সমিতির অনুগত সদস্যগণ, উপস্থিত যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহারা স্ব স্ব দায়রা সংসদের 'রেজুলিউশন' আকারে অথবা সাধারণ সভার মতামত, এই সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদের অধিবেশন তারিখের এক মাস বা ১৫ (পনর) দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় অফিস মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে পৌঁছাইতে হইবে। আবশ্যক বোধে জিলা সদর অফিসেও 'কপি' দিতে পারিবে এবং এই বিষয় লইয়া সাধারণ সভায় প্রস্তাব দিতে বিশেষ সভ্যের দ্বারা মতামত ব্যক্ত করিতে বা করাইতে পারিবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে সমিতির উন্নতিকল্পে মৌলিকতা, উদ্দেশ্যাবলী, নৈতিকতা ও রীতি-নীতি বজায় রাখিয়া আইন-কানুনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে সক্ষম থাকিবেন। তবে সেই উপধারাটি মোন্তাজেম ছাহেব যদি এন্তেজাম স্বার্থ পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন, তাহা আলোচনা সাপেক্ষে স্থগিত রাখিতে কিম্বা নাকচ করিয়া দিতে সক্ষম থাকিবেন। অর্থাৎ ভেটো প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৩য় অনুচ্ছেদ

(ক) অফিস বা কার্যালয় সংক্রান্তঃ-

(১) কেন্দ্রীয় সদর কার্যালয় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ মোকামে মোন্তাজেম ছাহেবের এন্তেজাম বা ব্যবস্থা মতে গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিলে হইবে।

(২) জিলা সদর কার্যালয় জিলা সদর এলাকার অফিস বেয়ারারদের পছন্দ মতে এলাকা সদস্যগণের সম্মতিক্রমে হইতে পারিবে।

(৩) শাখা-দায়রা কার্যালয়:- ঐ দায়রা এলাকা 'জোনেই' হইবে, যাহাতে সকলের যাতায়াতের সুবিধা হয়। সম্পাদক এবং সভাপতির সুবিধামতে এলাকার সদস্যগণের সম্মতিতে হইবে।

(খ) সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদের অধিবেশন বা সভা সংক্রান্তঃ-

(১) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদই সকলের বিশেষ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্বদলীয় সাধারণ সংসদের অধিবেশন বা সভার সময়, স্থান এবং তারিখ ঘোষণা করিবে। প্রত্যেক শাখা-দায়রা সংসদগুলিকে যথা সময়ে নোটিশ দ্বারা অবগত করাইবে।

(২) সম্পাদক ও সভাপতি স্ব স্ব এলাকার সংসদের সদস্যগণের ভোটেই নিযুক্ত হইবে।

(৩) বার্ষিক সর্বদলীয় সাধারণ কার্যকরী সংসদের সভাপতি, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের সভাপতিই থাকিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভার অন্যান্য সদস্যের মতামতে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি সাব্যস্থ করিয়া কাজ চালাইবেন।

বার্ষিক কেন্দ্রীয় সাধারণ অধিবেশনে অত্র সংসদের স্বায়ী সভাপতি স্বয়ং অথবা আবশ্যক বোধে সমিতির উন্নতিকল্পে যে কোন সম্মানিত বা পদস্থ ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচিত করিতে সক্ষম থাকিবে।

(গ) রেকর্ড :

আঞ্জুমানের প্রত্যেক কার্যালয়ের খাতা-পত্র নিম্নোক্তরূপে রক্ষিত রাখিতে হইবে।

১। সাধারণ ও বিশেষ চিহ্নিত সভ্য রেজিষ্ট্রার।
২। নোটিশ বই।
৩। প্রসিডিং এবং রেজুলিউশন খাতা।
৪। আগত পত্রাদির ফাইল।
৫। ভাউচার ফাইল।
৬। জমা-খরচ খাতা।
৭। সেভিংস ডিপোজিট বই।
৮। এন্ট্রি এবং ডেসপাচ খাতা।
৯। মেরিট বই বা বিশেষ মন্তব্য বই।
১০। ভিজিট বই।

৪র্থ অনুচ্ছেদ
– শিক্ষা ব্যবস্থা –

(ক) শিক্ষার কেন্দ্রীয় নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক দায়রা সমিতিগুলির অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে। সপ্তাহে কমপক্ষে একটি পাঠ নিশ্চয়ই দিতে হইবে। নচেৎ, উক্ত শাখা অকেজো বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

(খ) প্রত্যেক শাখা এলাকার সদস্যগণ যাহাতে স্বাবলম্বী হয় তাহার উপর চিন্তা ও অর্থকরি শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(গ) ২/৩ দুই কি তিন জন সদস্যকে কেন্দ্রীয় অফিস কিম্বা জিলা সদরে পাঠাইয়া শিক্ষা বা ট্রেনিং নিতে হইবে।

(ঘ) এই সব শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

(ঙ) এই দায়রা এলাকায় ন্যূনপক্ষে মাসে একবার নির্বিঘ্ন হালকা জজ্‌বার আদবমতে জলসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার সময়ের দূরত্ব ত্রিশ দিনের অধিক কখনো হইতে পারিবেনা।

(চ) এই মজলিশে সর্বপ্রথম গত-মাসের কার্য-বিবরণী পাঠান্তে ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি ঘোষণা করিবেন। এই সমিতির উন্নতির প্রতি এবং স্ব স্ব নৈতিক উন্নতির প্রতি সম্পাদক ছাহেব সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবেন।

(ছ) শেষে মোনাজাত সহকারে মজলিশ সমাপ্ত করিবেন।

৫ম অনুচ্ছেদ
নিয়ম পদ্ধতি সংক্রান্ত

(ক) ১। প্রত্যেক শাখা অফিসকে স্ব স্ব এলাকার সদস্যগণের ক্রমিক নং এবং শ্রেণী উল্লেখে নাম রেজিষ্টারী বই অবশ্য রাখিতে হইবে।

২। সপ্তাহ কিম্বা ১৫ দিন অন্তর অথবা প্রত্যেক মাসের পহেলা সপ্তাহে সভা বসিতে হইবে। তাহাতে শিক্ষার প্রগতি ও সমিতির উন্নতি সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা করতঃ রেজুলিউশন আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩। প্রতি তিন মাস অন্তর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট আকারে দরবার শরীফ কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাইয়া অবস্থা অবগত করিতে হইবে। তাহাতে নতুনভাবে সংগৃহীত সভ্যদের নাম, শ্রেণী উল্লেখে ক্রমিক নং সহ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৪। প্রতি ছয় মাস অন্তর কার্যকরী সংসদের সম্পাদক বা যে কোন অফিস বেয়ারার মাইজভাণ্ডার শরীফ কেন্দ্রীয় অফিসে উপস্থিত হইয়া, সমিতির হিসাব-পত্র দেখাইয়া রিপোর্ট হাছিল করিতে হইবে এবং আবশ্যকীয় উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে যাহা ভিজিট বইতে রক্ষিত রাখিতে হইবে। ত্রৈমাসিক রিপোর্টও এই সময়ে দিতে পারিবে।

৫। জমা-খরচ খাতা পরিষ্কার ভাবে রক্ষা করিতে হইবে, যাহার পোষকে আবশ্যকীয় ভাউচার ইত্যাদিরও ব্যবস্থা থাকিবে। অন্যান্য খাতা-পত্র ও যথাযথ রক্ষা করিতে হইবে।

৬। খাতা-পত্র যথাযথ ভাবে রক্ষা করা, সভা আহ্বান করা ও কেন্দ্রীয় অফিসে রিপোর্ট পাঠানো অফিস সম্পাদকের অবশ্য কর্তব্য।

৭। আগত পত্রাদি ক্রমিক নং পূর্বক ফাইল করিয়া রাখিতে হইবে এবং পত্র রেজিষ্টার খাতায় সংক্ষিপ্ত নোট রাখিবে।

৮। অফিস হইতে যে সব পত্র পাঠানো হয় করেসপণ্ডিং বইতে নকল রক্ষা করিবে।

৯। নোটিশ বই এবং প্রসিডিং বইগুলি নিয়মিত রক্ষা করিতে হইবে।

(খ) কেন্দ্রীয় অফিস এবং সদর জিলা অফিস ও উপরোক্ত নিয়মে খাতা-পত্র পরিষ্কার ভাবে রাখিতে বাধ্য থাকিবে।

(গ) কেন্দ্রীয় কার্যালয় নিম্নভাবে দুইটি বিশেষ রেজিষ্টারী খাতা রাখিবে।

(১) সমস্ত শাখা-দায়রা সংসদ গুলির ক্রমিক নং উল্লেখে প্রেরিত রিপোর্ট ফাইল থাকিবে, যাহাতে ঐ দায়রা সমিতির কার্যকরী সংসদের সমস্ত সদস্যগণ ও অফিস বেয়ারারদের নাম ও পদবী সহ বিস্তারিত বিষয় লিখা থাকিবে। উক্ত সমিতির সাধারণ সদস্য সংখ্যা, বিশেষ সদস্য সংখ্যা ও মোট সদস্য সংখ্যা, রেজিষ্টারের উপরিভাগে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) এই ২নং রেজিষ্টার খাতাতে বিশেষ সভ্যগণের ক্রমিক নং ও বিশেষ ফিসের রসিদ নং উল্লেখ পূর্বক পূর্ণ নাম, পিতার নাম, গ্রাম, পোষ্ট, থানা ও জিলা পরিষ্কার ভাবে লিখিতে হইবে এবং তাহা এই অফিসই রক্ষা করিবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সমিতি, জিলা সদর সমিতির নিকট অবগতির জন্য উক্ত জিলা সদর এলাকার অধীন এলাকাসমূহের বিশেষ সভ্য ও কার্যকরী দায়রা সমিতির অফিস বেয়ারারদের একখানা তালিকা পাঠাইয়া দিবে।

(৪) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ ইচ্ছা করিলে সর্বদলীয় সাধারণ সংসদের মঞ্জুরী সাপেক্ষে অর্গানাইজার নিযুক্ত, তাহার ভাতা ও আবশ্যকীয় খরচাদি মঞ্জুর করিতে এবং দিতে পারিবে। বিশেষ জরুরী খরচও চালাইয়া যাইতে পারিবে।

(ঘ) (১) ঐ জিলা সমিতিগুলি নিজ এলাকার সভ্যদের নাম ছাড়া ও কেন্দ্রীয় সমিতির দেওয়া সদস্যগণের নামের একটি তালিকা সমিতির ভিন্ন ভিন্ন সংসদের নাম উল্লেখপূর্বক তদ এলাকার বিশেষ সভ্যগণের নামে প্রেরিত একখানা ফাইল বা তালিকা রাখিবে।

(২) আবশ্যক বোধে জিলা সমিতি শাখা-সমিতিগুলির খাতা-পত্র দেখিতে এবং প্রয়োজনীয় ভিজিট-রিমার্ক বা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে।

ভিজিট রিপোর্টের একখানা কপি নিজে রাখিবে এবং অবগতির জন্য কেন্দ্রীয় অফিসে এক কপি পাঠাইবে।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ
তহবিল সংক্রান্ত

(ক) দায়রা সমিতির তহবিলঃ তাহাদের সংগৃহীত দান, চাঁদা, এই এলাকার জনগণ কর্তৃক দান করা, উইল বা ওয়াক্‌ফ করা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির আয়, তাহা দ্বারা গঠিত ও অর্জিত তহবিল সমূহ এই দায়রা সমিতির জিম্মা সম্পত্তি বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। সংগৃহীত টাকা বা সম্পদ কিম্বা স্থাবর সম্পত্তির সংবাদ তিন মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় অফিসকে অবশ্য জানাইতে হইবে।

(খ) জিলা সদর সমিতিঃ এই সমিতির তহবিলও ঐভাবে গঠিত হইতে পারিবে। ইহা ছাড়াও জিলা সমিতির রায় বা স্কীম মতে সংগৃহীত সম্পদ বা সমিতির অর্থদ্বারা সংগৃহীত, সঞ্চিত স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পত্তি কিম্বা সম্পদ বা অর্জিত আয় সমস্তই এই জিলা সদর সমিতির জিম্মা সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। যথাঃ- ম্যাগাজিন আয়-ব্যয়, ইত্যাদি এজেন্সী সহ।

(গ) কেন্দ্রীয় সমিতির তহবিলঃ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর কেন্দ্রীয় সমিতির এই উদ্দেশ্যে উদ্যোগ, আয়োজন দ্বারা সংগৃহীত দান, চাঁদা এবং এই উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় প্রণোদিত ও প্রদত্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অথবা উইল বা ওয়াক্‌ফ করা ভূ-সম্পত্তির আয়।

২। শাখা-দায়রাগুলির অনুমোদন ফি, ঐ দায়রা এলাকার বিশেষ সভ্য ফি ও ট্রেনিং ভাতা, চাঁদা বা গ্র্যাণ্ডসমূহ ও অনুমোদন ফি।

৩। (ক) সর্বদলীয় সাধারণ অধিবেশন বা কনফারেন্স ডেলিগেট ফিস, (খ) দারুত-তায়ালীম বা শিক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষতা ও প্রসারের জন্য শিক্ষানুরাগীর দান ইত্যাদি, (গ) শাখা-সমিতিগুলি হইতে আগত ট্রেনিং প্রার্থীর আবশ্যকীয় খরচের জন্য আয় সমূহ, (ঘ) এই আঞ্জুমানে দান করা বই পুস্তকের আয় সমূহ, (ঙ) এই সমিতির নিজস্ব ছাপানো বই পুস্তক,

পাম্পলেট ইত্যাদির আয়, (চ) জিলা সমিতি ও শাখা সমিতি সমূহের প্রদত্ত মঞ্জুরী সমূহ, কেন্দ্রীয় সমিতির জিম্মা সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৭ম অনুচ্ছেদ
মতামত ব্যক্ত ও ভোট প্রদানে স্বাধীনতা

(ক) ১। যাহারা শাখা-দায়রা সংসদের সাধারণ সভ্য তাহারা ঐ এলাকার দায়রা সংসদ গঠিত হওয়ার সময় বিশেষ সভ্য শ্রেণীর প্রার্থী সদস্যগণকে ভোট দিয়া নির্বাচিত করিতে পারিবেন। বিশেষ সভ্য শ্রেণীভুক্ত না হইয়া কেহ কার্যকরী সংসদের প্রার্থী বা সদস্য হইতে পারিবেন না।

২। যাহারা এই সাধারণ সভ্য পদবী ছাড়া কেন্দ্রীয় সংসদ মাইজভাণ্ডার শরীফ অফিসে ১ টাকা ফিস দিয়া রসিদ হাছিল পূর্বক বিশেষ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাহারা শাখা দায়রা সংসদে ঐ এলাকার কার্যকরী সংসদের সদস্য পদপ্রার্থী ও অধিকাংশ ভোটে নির্বাচিত হইতে যোগ্য বলিয়া সাব্যস্থ হইবেন।

৩। এই কার্যকরী সংসদের অধিকাংশ ভোটে সম্পাদক বা সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারিবে। কোষাধ্যক্ষ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হইবে বিধায়, সম্পাদক বা সভাপতির প্রস্তাবে অধিকাংশ সদস্যের মতামতে নিযুক্ত হইবে।

৪। এই বিশেষ শ্রেণীর সভ্যগণ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ এবং জিলা সদর সংসদে উপস্থিত হইয়া, মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

(খ) ১। শাখা সংসদের নির্বাচিত সদস্যগণ অফিস বেয়ারার বা ভারপ্রাপ্ত সদস্য কেন্দ্রীয় অফিসে বা জিলা সদর অফিসে হাজির হইয়া হিসাব-পত্র দেখাইতে, ভিজিট বইতে রিমার্ক বা মন্তব্য ও রিপোর্ট লেখাইয়া নিতে পারিবে এবং অফিস রিপোর্টও দিতে পারিবে। বিশেষ সভ্য ফি জমা দিয়া রসিদও গ্রহণ করিতে পারিবে।

২। কোষাধ্যক্ষ নিজ হাতে জরুরী খরচের জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা হাতে জমা রাখিতে পারিবে। অতিরিক্ত টাকা পোষ্টাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে কিম্বা কোন রেজিষ্টার্ড ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে।

৩। উক্ত জমা টাকা উঠাইবার বেলায়, কমিটির মতামতে সম্পাদক বা সভাপতি সাহেবের দস্তখত ছাড়া উঠাইতে পারিবেনা। যুক্ত স্বাক্ষর ছাড়া উঠান বে-আইনী সাব্যস্ত হইবে।

৪। এই শাখা সমিতিগুলি সর্বদলীয় সাধারণ সভায় বা সংসদে কোনরূপ মতামত ব্যক্ত করিতে চাহিলে, এক মাস পূর্বে লিখিত মতামত বা প্রবন্ধ কেন্দ্রীয় অফিস মাইজভাণ্ডার মোকামে পৌঁছাইতে হইবে। ইচ্ছা করিলে জিলা সদর অফিসে কপি দিতে পারিবে।

৫। সাধারণ সভ্যগণও দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন কিন্তু চেয়ারম্যান-এর অনুমতি ব্যতীত কোন মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন না।

(গ) ১। কোন সদস্য বা সভ্য সভা চলাকালীন সময়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কথার ভিতরে উষ্মা, ব্যঙ্গোক্তি, অসৌজন্য ব্যবহার বা উত্তেজনা দেখাইতে পারিবেনা; করিলে, শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বহিষ্কারের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২। এই সমিতির অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংযম, ধৈর্য্য, সৌজন্যতা বজায় রাখিয়া অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি প্রস্তাব পেশ ও মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

৩। সভার বাহিরে কোন প্ল্যাটফরমে, পত্রিকায় বা জন সমাজে এই সমিতির স্বার্থ বিরোধী কথা বার্তা ও মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেনা। কুৎসা প্রকাশ ইত্যাদি নীতি-বিরুদ্ধ বিধায়, ঐ ব্যক্তি সমিতির পদ হইতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) ১। এলাকার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দিতে হইলে তাহাও সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের কার্যালয় মাইজভাণ্ডার শরীফ মোকামে পৌঁছাইতে হইবে।

২। কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ তদন্তক্রমে ঐ ব্যক্তি বা সংসদকে সাময়িক বরখাস্ত বা বাতেল করিতে পারিবেন। হঠাৎ প্রয়োজন হইলে মোন্তাজেম ছাহেব নিজেই বরখাস্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু পরবর্তী সভায় কার্যকরী সংসদের মঞ্জুরী লইতে হইবে।

৩। যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিতে হইলে উক্ত এলাকার অধিকাংশ সভ্যের মতামত দরকার হইবে।

৪। মোন্তাজেমের অপসারণ ও নিয়ুক্তির ব্যাপারে হজরত আকদাসের পুত্র বংশের সংখ্যাধিক্যের মতাদিতে সাব্যস্ত হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ব্যাপারে উপরে বর্ণিত নিজ 'ভেটো' ক্ষমতা কার্যকরী হইবেনা।

৫। এমতাবস্থায় তাঁহাদের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় একজন পুত্র-বংশীয় সুযোগ্য ব্যক্তিকে মোনতাজেম স্বীকারে সমিতির কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

(ঙ) ১। এই এন্তেজামীয়া সংসদগুলি তিন হইতে পাঁচ বৎসরের ভিতর পুনঃ গঠিত হইতে হইবে।

২। যেই কোন শাখা দায়রা সংসদকে এই সময়ের মধ্যে বরখাস্ত বা বাতেল ঘোষণা করিতে হইলে তাহাতে জেনারেল সংসদের মঞ্জুরী দরকার হইবে।

(চ) ১। কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি নিজ আয় ব্যয় সমবৎসরের কার্য-বিবরণী এবং শাখা সমিতিগুলির অবস্থা সম্বলিত রিপোর্ট ও সদর জিলা সমিতির কার্যক্রম সম্বলিত বার্ষিক রিপোর্ট, অডিট রিপোর্ট সহ জেনারেল কমিটিতে দাখিল করিয়া মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে।

২। এই মঞ্জুরীকৃত রিপোর্ট কপি প্রত্যেক শাখা সংসদ গুলিকেও দিতে হইবে।

৮ম অনুচ্ছেদ
তহবিল ও কোষাধ্যক্ষ সংক্রান্ত

(ক) ১। কোষাধ্যক্ষ স্থানীয় বিশ্বস্ত সমর্থশালী ব্যক্তি হইতে হইবে। অথবা স্থানীয় গদি, তহবিল কিম্বা পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক বা রেজিষ্টার্ড ব্যাঙ্ক হইতে হইবে।

২। কোষাধ্যক্ষ কিম্বা সম্পাদক বা সভাপতি যে কেহ টাকা জমা রাখিতে পারিবেন। উঠাইবার বেলায় দুইজনের যুক্ত স্বাক্ষর ছাড়া উঠানো অসিদ্ধ ও বে-আইনী হইবে।

৩। যে কোন প্রকার তছ'রোফ প্রমাণিত হইলে তাহাকে বরখাস্ত করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তছরোফ কারীর বিরুদ্ধে আইনতঃ যে কোন প্রকার প্রতিকার করিতে ও তছরোফ কৃত টাকা উসুল করিয়া লইতে কার্যকরী সংসদের সদস্যগণ সর্বতোভাবে সমর্থ থাকিবেন। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় অফিস মাইজভাণ্ডার শরীফ মোত্তাজেম ছাহেবকে অবগত করিতে হইবে। এ হেন অবস্থায় তিনি কোন রুলিং দিলে তাহা কার্যকরী সংসদের সিদ্ধান্তেই চরম সাব্যস্ত হইবে।

(খ) ১। কেন্দ্রীয় সংসদ কোষাধ্যক্ষের নিকট ১০০০ (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত জমা রাখিতে পারিবেন। হক ব্রাদার্স মালিকানা ব্যাঙ্কের জেনারেল তহবিল বা প্রাইভেট ব্যাঙ্কের জমা খরচ খাতা এই হিসাবের কোষাধ্যক্ষ সাব্যস্ত থাকিবে। বেশী টাকা যে কোন রেজিষ্টার্ড ব্যাঙ্কে জমা রাখিবে।

২। জিলা সদর সংসদ জরুরী বা দৈবাৎ খরচের জন্য কোষাধ্যক্ষের নিকট ১০০ (একশত) টাকা পর্যন্ত জমা রাখিতে পারিবে। বেশী টাকা যে কোন রেজিষ্টার্ড ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে।

৩। শাখা দায়রা সংসদ কোষাধ্যক্ষের নিকট ২৫ (পঁচিশ টাকা) পর্যন্ত প্রয়োজনীয় খরচের জন্য রাখিতে পারিবে। অবশিষ্ট টাকা পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে। উঠাইবার বেলায় উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী দুইজনের যুক্ত স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে। বে-আইনী কাজের জন্য সকলই সর্বতোভাবে দায়ী থাকিবে।

৯ম অনুচ্ছেদ
জায় খরচ সংক্রান্ত

১। প্রত্যেক শাখা দায়রা সমিতি নিম্নোক্তভাবে খরচ করিতে পারিবে।
(ক) কন্টিজেন্সি খরচ।
(খ) দারুত-তায়ালীম বা বয়স্ক শিক্ষাগারের ভাতা ও বেতন খরচ।
(গ) প্রত্যেক এলাকার মাসিক জলসা খরচ স্ব স্ব এলাকা বহন করিবে।

২। জিলা সদর সমিতির খরচের জায়:-
(ক) কন্টিজেন্সি বা খাতা পত্র ও শিক্ষোপকরণ খরচ।

(খ) এই এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বয়স্ক শিক্ষাগারের শিক্ষক-ভাতা বেতন খরচ।

(গ) এই সদর এলাকাতে এবং তাহার অন্তর্গত সমস্ত শাখা এলাকাতে প্রচার খরচ।

(ঘ) ঐ এলাকার মাসিক জলসা খরচ।

(ঙ) বার্ষিক সাময়িকী বা ম্যাগাজিন ও পাম্পলেট ইত্যাদির খরচ।

৩। কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর জায় খরচঃ-

(ক) কন্টিজেন্সি ও শিক্ষোপকরণ খরচ।

(খ) এই কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত দারুত-তায়ালীমের শিক্ষকের বেতন খরচ।

(গ) অর্গানাইজার ভাতা এবং প্রচার খরচ।

(ঘ) আইনজ্ঞ ভাতা।

(ঙ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ এবং সর্বদলীয় সংসদের সভার খরচ।

(চ) বার্ষিক রিপোর্ট।

(জ) অতিরিক্ত কাজের জন্য অফিস সম্পাদকের ভাতা খরচ।

(ছ) অডিটর কমিশন।

(ঝ) ট্রেনিং ও শিক্ষা উপলক্ষে বই পুস্তকের খরচ।

(ঞ) খাদেমানে গাউছে আজম মাইজভাণ্ডারী সেবক সংঘের আবশ্যকীয় ভাতা ও রাহা খরচ, ইউনিফরম, বেইজ, ইত্যাদি খরচ।

(ট) সম্ভব হইলে দুর্গত সভ্যভুক্ত ভক্তকে আর্থিক বা মেটেরিয়েলস সাহায্য করা।

(ঠ) টেলিগ্রাম, ট্রাঙ্কল, পত্রিকা ও বেতার মারফতে প্রচার ইত্যাদি খরচ (প্রত্যেক দায়রা, জিলা ও কেন্দ্রীয় সংসদের) নিজ দায়ীত্বে থাকিবে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী,
গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল,
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ।
পোষ্টঃ-ভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

গমাপ্ত

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks

ISBN: 978-984-8083-38-3